বিলেত দেশটা মাটির
ও
অন্যান্য গল্প

জ্যোতির্মালা দেবী

বিলেত দেশটা মাটির
ও
অন্যান্য গল্প

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

মুখবন্ধ

জ্যোতির্মালা দেবীর 'বিলেত দেশটা মাটির' এবং অন্যান্য কিছু রচনা পুনঃপ্রকাশ করতে গিয়ে নারীর ব্যক্তিগত জীবন ও তার সৃজনশীল প্রতিভার মধ্যে সংঘাতের উদাহরণ বারবার আমাদের চোখে পড়েছে। তাঁর লেখাগুলিতে আমরা এমন কিছু উপাদান পাই যা নাকি একেবারেই 'নারীসুলভ' নয় বরং এক ধরণের তীব্রতা ও প্রতিবাদী মনোভাব লেখাগুলির মধ্যে কাজ করে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে আবেগপ্রবণতার কথা প্রতিভা বসু বলেছেন, তাঁর লেখায় তার ইঙ্গিত আছে ঠিকই, কিন্তু সেই আবেগের উৎস তাঁর মনন। তিনি যে অনেক লিখেছিলেন তা নয়, কিন্তু সমাজসম্পর্কের কিছু নতুন দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিলেতের পটভূমিতে লেখা গল্পগুলি ব্রিটিশ-শাসিত এক দেশ থেকে আসা একটি মেয়ের চোখ দিয়ে ব্রিটিশ সমাজকে উপস্থাপিত করে। যিনি কথক তিনি একাধারে নারী এবং সাম্রাজ্যবাদশাসিত মানুষ। এই হিসাবেই কাহিনীগুলি একটা ভিন্ন মাত্রা পায়। আবার তাঁর অন্যান্য গল্পগুলিতেও অনেক জায়গাতেই যার দৃষ্টি দিয়ে কাহিনীটিকে নির্মাণ করা হয়, সে একজন নারী। তাঁর লেখার এই বিশেষ ঝোঁকটি আমাদের চোখে লেখাগুলিকে মূল্য দিয়েছে।

জ্যোতির্মালা দেবীর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। 'জ্যোতির্মালা : জীবন ও সাহিত্য' বইটিতে সুস্নিগ্ধা বড়ুয়া বিস্তারিতভাবে সেসব কথা বলেছেন। আমাদের কাছে যা অর্থবহ বলে মনে হয় তা হল এই যে, উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়েদের জীবন যে কক্ষপথে বিবর্তিত হয়, তিনি যেন একেবারেই তার বাইরের। প্রতিভা বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—'আমার কোনো ধর্ম নেই, আমার বাবা বৌদ্ধ।' —চট্টগ্রাম জেলার বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ পরিবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু নিজস্ব কৌতূহল থেকেও বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে একসময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন কম্যুনিস্ট ভাবধারায়, আবার অরবিন্দের আধ্যাত্মিকতাও তাঁকে এতখানি আকৃষ্ট করেছিল যে একসময় পণ্ডিচেরীর আশ্রমের বাসিন্দা তিনি হয়ে যান। আবার সাহিত্যচর্চা করার জন্য আশ্রমজীবনও তিনি ত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যজীবনের এক গভীর অন্তর্বিরোধ তাঁকে আলোড়িত করেছিল। তিনি ছিলেন এক প্রতিভাময়ী ছাত্রী। বাড়িতে লেখাপড়ার ধারা ছিল ঠিকই, কিন্তু কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করার পরে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এবং জেদে পড়াশোনা করার জন্য বিলেতে চলে যান। অবশ্য এর পেছনে ছিল পিতার সমর্থন ও সাহায্য। কিন্তু গণ্ডির বাইরে বেরোনোর প্রবণতা তাঁর নিজের যদি না থাকত তাহলে ১৯২৪ সালে একাকিনী বিলেতে যাবার কথা তিনি কখনো ভাবতেন না। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি বেশ কিছুদিন ঢাকায় একটি স্কুলে চাকরি করেন। পরে কিছুদিন কলকাতায় একটি ইনশিওরেন্স কোম্পানিতেও। একা একাই থাকতেন তিনি। কিন্তু সুস্নিগ্ধা বড়ুয়ার ভাষায়,—'এ সব

চাকরি তাঁর খাওয়া-পরার চাহিদা পূরণ করছিল। এই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জীবন কখনো তিনি চাননি। সৃষ্টিশীল শিল্পজীবন চেয়েছিলেন তিনি।'—পরবর্তীকালে এই চাকরিও ছেড়ে দিয়ে তিনি পণ্ডিচেরীতে চলে যান। এখানেও তাঁর জীবন জুড়ে যেন এক অতৃপ্তির ঝোড়ো হাওয়া বইতে দেখি আমরা। বিবাহ করেছিলেন দু'বার। প্রথমবার বিলেতে থাকার সময় এবং দ্বিতীয়বার ময়মনসিংহের জমিদারবাড়ির ছেলে বীণাবাদক বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে। দ্বিতীয় বিয়ে হয় শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ নিয়ে। দুটি বিয়েই বাঙালি মেয়েদের প্রথাগত আদলের বাইরে। নিজস্ব পছন্দ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কিন্তু কোনো বিয়েই স্থায়ী হয়নি। প্রত্যেকবারই সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ছিল জ্যোতির্মালার নিজেরই। এখানেও তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সংসারজীবন বলে তাঁর কিছু ছিল না। শেষ জীবনটা ছিল ছন্নছাড়া। জানা যায়, পরে কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা পরিচয় পাই এমন এক ব্যক্তিত্বের, যে ধরাবাঁধা পথে চলতে নারাজ এবং তারজন্য সবরকম ফলাফল মেনে নিতেও প্রস্তুত। মনে হয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা সামান্য অংশই তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।

কীভাবে আমরা জোড় মেলাব এই সঙ্কটসঙ্কুল জীবনধারার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক প্রকৃতির? তাঁর আসল নাম ছিল জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী। লেখার সময় নাম নিয়েছিলেন জ্যোতির্মালা দেবী। দ্বিতীয় বিবাহের পরে 'বধূরাণী' ছদ্মনামেও কিছু লেখা তাঁর আছে এই ছদ্মনামগ্রহণ কি সূচিত করে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে স্বেচ্ছাবিচ্ছেদ? সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে কি তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এক দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব? ভোক্তা-বিহঙ্গ ও দর্শক-বিহঙ্গের মধ্যে এক নির্মিত দূরত্বের বিস্তারই কি তাঁর সাহিত্যজীবনকে চিহ্নিত করে?

এই গ্রন্থটিতে আমরা জ্যোতির্মালা দেবীর লেখা আটটি ছোটগল্প একত্রে সংকলন করেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠি এখানে আছে। আছে *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি পুস্তক সমালোচনা। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে আসেন কোন জ্যোতির্মালা? ছোটগল্পগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বিলেতের পটভূমিকায় লেখা। 'পরিচয়' ও 'ভাঙ্গা-গড়া' এই গল্পদুটি 'বিলেত দেশটা মাটির' সংকলনেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তার পটভূমিকা 'দেশী'। অন্য দুটি গল্প 'হৃদয়ের রঙ' ও 'সোনালি' যথাক্রমে *পরিচয়* ও *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি গল্পেরই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক বা একাধিক নারী। হয়তো ধরে নেওয়া যায় বিলেতের পটভূমিতে লেখা গল্পগুলিতে তাঁর নিজের কিছু অভিজ্ঞতাকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন তিনি। বাঙালি তরুণী বিলেতে গিয়ে সেখানে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে তারই ছোট ছোট চিত্র কয়েকটি গল্পে। বর্ণবিদ্বেষী সাদা চামড়ার মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হবার সোজাসাপটা কাহিনী 'সেটা সোনার রূপোর নয়' এবং 'নীল রক্ত'। একটি ভিন্নতর পটভূমিতে এক নারীর অভিজ্ঞতা, এইটুকুই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিলেতের পটভূমিকায় অন্য দুটি গল্প আরো জটিল। একটিতে কথক এক পুরুষ। গল্পটির নাম 'রাশিয়ান ক্যাট'। গল্পটিতে কথক তাঁর মৃত স্ত্রীর স্মৃতিচারণা করছেন। মিনু নামের 'রাশিয়ান

ক্যাট'টি এখানে মৃত অপর্ণা এবং তাঁদের প্রবাসজীবনের যুগ্মস্মৃতিকে উশ্কে দিতে সাহায্য করছে। এখানে লেখিকা কথনের যে বিশিষ্ট শৈলী আবিষ্কার করেছেন তার মধ্য দিয়ে গল্পটির চরিত্রায়ণ গভীরতর মাত্রা পায়। বিলেতের পটভূমিতে লেখা 'অকারণ' আর পরবর্তীকালে পত্রিকায় প্রকাশিত 'হৃদয়ের রঙ' ও 'সোনালী'-তে কথক নারী। কোথাও এক নারী শুনছে আরেক নারীর কাহিনী। কোথাও বা এক নারীর জবানীতে ফুটে উঠছে হারিয়ে যাওয়া আরেক নারীর স্মৃতি। 'অকারণ' গল্পটিতে মিস্ টমাস নিজের এবং ছোট বোনের কাহিনী বলছেন যূথীকে। 'হৃদয়ের রঙ' গল্পটিতে 'আমি' প্রধানত শ্রোতা। আগন্তুক অণিমা তাকে শোনাচ্ছে নিজের প্রেমের কাহিনী। কিন্তু গল্পটির শেষে দেখা যায় সেই 'আমি'-ও নিজের অজান্তেই অণিমার গল্পের আরেকটি মূল চরিত্র। 'সোনালি' গল্পে গল্পের কাঠামোটি মীনা ও সোনালির বন্ধুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মীনা কর্ণফুলীর স্রোতে নৌকা নিয়ে তাদের অভিযানের কথা মনে করতে করতে বলে যাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া সোনালির কাহিনীর। আবার মীনার নতুন কাকিমার সঙ্গে মীনার যে কথোপকথন তার মধ্য দিয়েও জেগে ওঠে সোনালির স্মৃতি। তার পোষা রাজহাঁসদুটি মরে গেছে, আর কল্পনা করা যায় প্রেমে অতৃপ্ত সোনালিও কর্ণফুলী থেকে ভেসে গেছে সাগরে। মেয়েদের নানাধরণের জবানী এইভাবে গল্পের বুনোটটি তৈরি করে দেয়। এক মেয়ের চোখে দেখা আরেক মেয়ে, এক মেয়ের কণ্ঠে তার নিজের অথবা অন্য এক মেয়ের কাহিনী, একটি আরেকটির সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে যাচ্ছে কাহিনীর গঠনে। এইটিই তাঁর গল্প বলার বৈশিষ্ট্য। 'পরিচয়' ও 'ভাঙ্গা-গড়া' গল্পদুটি সত্যিই 'দেশী'। তার পটভূমি গ্রামের সমাজ। এই দুটি গল্প প্রধানত দুটি মেয়ের চোখ দিয়েই দেখা। দুটিতেই মেয়েটি যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা হল কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুর। এখানেও লেখিকার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছোঁয়া থেকে থাকতে পারে। তাকে আশ্রয় করে সংবেদনশীলতার বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্মালার লেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তাঁর প্রত্যেক পটভূমিতেই পরিস্ফুট হয়েছে রমণীসুলভ কমনীয়তা, সহৃদয়তা ও পর্যবেক্ষণশীলতা।'—এটা ঠিকই যে জ্যোতির্মালার গল্পগুলি নারী-প্রধান। তবু 'কমনীয়তা, সহৃদয়তা ও পর্যবেক্ষণশীলতা'—এই তিনটি গুণকে শুধু 'রমণীসুলভ' না ভেবে যদি আমরা একজন সৎ সাহিত্যিকেরই মৌলিক চরিত্রলক্ষণ বলে মনে করি, তাহলে বোধহয় জ্যোতির্মালা দেবীর গল্পগুলির প্রতি আমরা সুবিচার করতে পারব। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠিতে জ্যোতির্মালা নিজের গল্প সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—'ওগুলো লিখে আমি কোনোদিনই যথার্থ বা গভীর তৃপ্তি পাই নি, তাদের প্রতি দরদও তাই যৎসামান্য।' —এটা নিছক বিনয়ের কথা ছিল না। যা লিখেছেন এবং যা লিখতে চেয়েছেন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং তার শিল্পায়ন—এই দুয়ের মধ্যে অনপনেয় যে ফারাক একজন খাঁটি শিল্পীকে বেদনা জর্জরিত করে, জ্যোতির্মালা হয়তো এখানে তারই কথা বলছিলেন।

মালিনী ভট্টাচার্য

বিলেত দেশটা মাটির

বি	সেটা সোনার রূপোর নয়
লা	নীল রক্ত
	রাশিয়ান ক্যাট
তী	অকারণ

সেটা সোনার রূপোর নয়

ঘরের একপাশে দুটি ছেলে বিলিয়ার্ড খেলছে, অন্য পাশে আর দুজন খেলছে পিং-পং। সুধীর বোস আর চারু দত্ত সিগারেট মুখে, ট্রাউজারের দুপকেটে দুহাত ঢুকিয়ে দিয়ে কায়দা ক'রে জান্‌লায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে কখনো বা খেলা দেখছে, কখনো বা জান্‌লার কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের সূর্য্যালোকিত রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে কি-সব বলছে। মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য যা করছে তা শুধু ওদের মধ্যেই চলতে পারে। মহিলা তো দূরের কথা, তৃতীয় কোনো পুরুষ বন্ধুও সে-সব শুনলে একটু লাল না হ'য়ে, অন্তত তার কানের পাশটা একটু গরম না হয়ে থাকতে পারত না—এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। কিন্তু সুধীর আর চারুর দোষ কি? দুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু একত্র হ'লে—বিশেষত এমন সুন্দর জ্যোতিরুচ্ছল দিনে,—রাস্তায়-ঘাটে যখন রং-বেরঙের ফুলের ছড়াছড়ি, মাথার উপরে নীল আকাশ সুন্দরীর চোখের মতো স্নিগ্ধ কমনীয়, সহরের মাঠে মাঠে, পাহাড়ে, দোকানে যেখানেই যাও সুরূপা সুবেশার মনোরম কটাক্ষ, যার হাত থেকে কোথাও গিয়ে উদ্ধার পাবার জো-টি নেই তেমন দিনে—এত হাসি, গান, রূপের, রঙের সমাবেশের মধ্যে—মনটা হাল্কা না হ'য়ে পারে কখনো,—একটি দুটি হাল্কা কথা না ব'লে থাকতে পারে কেউ?—বিশেষত যাদের কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, নেই খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম, বাড়ি থেকে যাদের দিব্যি মাসের পর মাস গুনতি টাকা এসে হাজির হয়—তা হোক না সে টাকা বাপের, বড়-ভাইয়ের—আর শ্বশুরের হ'লে তো কথাই নেই—বুকের রক্ত জল করা ধন! এমন নিশ্চিন্ত মুক্ত বেপরোয়া স্কন্ধ নিয়ে চারু আর সুধীর যে মিনিটে মিনিটে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মেরী, ডলি, লিলি আর রেবেকার দলকে দেখে একটু-আধটু আমোদ করবে এবং তা-ও নিছক কথায় মাত্র—সত্যিই তো কেউ আর রাস্তায় নেমে গিয়ে 'প্রেয়সী, এস' ব'লে ওদের বাহু এগিয়ে দিচ্ছে না—শুদ্ধ কথায়, নিরামিষ কথায় যে একটু আমোদ করবে, তাতে এত আশ্চর্য্য হবার আছে কী? এই ছুটিতে, ভাগ্যবান যারা তারা তো বেরিয়েই গিয়েছে—কেউ দিয়েছে কন্টিনেন্টে পাড়ি, কেউ আইল্ অব্ ওয়াইটে, কেউ বা বেশি দূর না পারুক, অন্তত লণ্ডনে। যে-হতভাগ্যেব দল পরীক্ষা অথবা বাইরে যাবার যথেষ্ট টাকার অভাব ইত্যাদি কোনো-না-কোনো অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হ'য়ে এই সুন্দর গ্রীষ্মটাকে মাঠে মারা যেতে দিচ্ছে, তারা এটুকুও যদি করতে না পারে, তবে এত বড় রাত ও দিন কাটে কী ক'রেই বা এই উত্তুরে দেশে—যেখানে পারী-র মতো না আছে সত্যিকার 'ফ্রিডম্', না লণ্ডনের চোখ-ধাঁধানো জাঁকজমক!

এরকম নীরস জায়গায় পড়তে আসাই ঝকমারী।—সুধীর হাতের সিগারেটটায় আর একটা লম্বা টান দিয়ে আব একবার বাইরের দিকটায় মুখ ফিরিয়ে—'হ্যালো, এ যে সন্দীপ! আরে, I say—সন্দীপ! সন্দীপ!' ব'লে জানলায় দুবার টোকা দিয়ে পথচারী বন্ধুর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি জান্‌লার কাচটা তুলে ধরলে এবং ঘাড়টা বের ক'রে দেখে আশ্বস্ত হ'ল যে, সন্দীপ এখানেই আসছে।

—'তারপর, কী মনে ক'রে? হঠাৎ যে পথ ভুল? যা ঘাড়-মুখ গুঁজে পড়ছ তুমি, ভাবিনি যে একরত্তি আলো থাকতেও বই ছেড়ে উঠবে। ভাগ্যিস ডাক্তার রাত্তিরে পড়াটা

বারণ করেছে—নইলে একটা কাণ্ডই ক'রে বসতে। তারপর, খবর কী বলো?'

—'মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা কেন ভাই? তিন-তিনটে সাব্‌জেক্ট বাকি প'ড়ে আছে জানোই তো। এবারও পাশ করতে না পারলে আর কোন্ ভরসায় টাকা চাইব দাদার কাছে? তোমাদের মতো তো নয়—কত কষ্ট ক'রে এসেছি এ-দেশে,—তাও একটা বছর মাটি—অসুখে প'ড়ে। "অভাগা যেখানে যায়—সমুদ্র শুকায়ে যায়"— '

চারু সুধীরকে টিপে দিলে।

—'যাক্‌গে সে-সব কথা। এখন হঠাৎ এলে যে এসোসিয়েশানে?'

—'এলুম এখানে তোমাদের দেখা পাবো জানি ব'লে—'

—'কেন রে, আমরা হঠাৎ কবে এমন ডুমুর-ফুল হ'য়ে উঠলুম তোর কাছে? ব্যাপার কি?' বলতে বলতে শ্যামবর্ণ দীর্ঘদেহ একটি ছেলে এক কোণের টেবিল থেকে উঠে এল। সে এতক্ষণ এ-সব কথাবার্ত্তা মন দিয়ে শুনছিল।

—'এই যে রাজেন, তুমিও আছ। ভালোই হ'ল, সবাইকে একসাথে পাওয়া গেছে। ভাই, দেখো দিকি, সুকুমার আমাকে কী বিপদে ফেলেছে—বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এক পোষ্টকার্ড—ওর বোন আসছে, ঘর ঠিক করতে হবে এবং তা-ও ঝটিতি—অর্থাৎ আজই।'

—'হুঁ, সুকুমারটা চিরদিনই ঐ-রকম—'

—'দেখি কী লিখেছে'—চারু পোষ্টকার্ডটা হাত থেকে টেনে নিল।—'ও বাবা, বোন নয়, একেবারে "ভগ্নী-মহোদয়া আসছেন"—'

রাজেন থামিয়ে দিল—'যা, যা, সুকুর লেখার ধরণই ও-ই। ফাজলামো ছেড়ে দিয়ে এখন বরং চল্ রূম দেখতে বেরিয়ে পড়া যাক। কাল সকালেই তো এসে পড়বে দুজনে। সুকুর ঘর তো ঠিক আছেই তোর ওখানে, না রে সন্দীপ?'

সন্দীপ মাথা নেড়ে জানালে—'হ্যাঁ।'

—'তবে আর কি, আর একটা ঘর কি পাওয়া যাবে না এই এতবড় এডিনবরা সহরে?'

—'ঘর পাওয়া যাবে না কেন? একটার জায়গায় চারটে দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এ তো তোমার আমার জন্য নয় হে, এ যে লেডি নিয়ে ব্যাপার—'

—'এই সিজ্‌ন্‌-এ লণ্ডনের মতন সহর ছেড়ে হঠাৎ এই পাড়াগাঁয় কেন পদার্পণ বাপু? কি হে সন্দীপ, সুকুমার লিখেছে না কি কিছু?'—সুধীর জিজ্ঞেসা করলে।

সন্দীপ বললে—'না, সুকুমার রহস্য ভালোবাসে, জানো না? নিজে এখান থেকে গিয়েছে এই সবে দিন-পনের, এরই মধ্যে ফিরে আসছে—সঙ্গে আবার বোনকে নিয়ে —কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই লেখেনি।'

—'এলেই জানা যাবে রে, এখন চল্ একটু পা চালিয়ে, ঘর একখানা ঠিক ক'রে এসে যত পারিস জল্পনা-কল্পনা করিস সুকুর বোনকে নিয়ে।'

সকলে হেসে উঠল।

২

অনেক খুঁজে-পেতে বাড়ি পাওয়া গেল—মার্চ্চমন্ট' রোডে। ঘরটা বেশ ভালই, রাস্তার উপরে, কাচ-দেওয়া বড় বড় জানালা, আসবাব-পত্র মন্দ নয়। ফ্ল্যাটখানি দোতলায়। সন্দীপ খুশি হ'য়ে বললে—'সুকুমার বলতে পারবে না—এডিনবরায় ওর "ভগ্নী মহোদয়ার" অভ্যর্থনা যথোপযুক্ত হয়নি—তাও এত শর্ট নোটিশে।'

—'নাঃ—ঘর মন্দ হয়নি। এখন বুড়ি বাড়িওয়ালি—'

—'ধ্যেৎ, বুড়ি নয়রে, মাত্র একটি খুকির মা এবং খুকিটি এই'—একটি বছর-সাতেকের লাল-ফ্রক পরা মেয়েকে দেখিয়ে চারু বললে।

—'ও একই কথা, বাড়িওয়ালি হ'লেই বুড়ি—আমাদের আদরের ডাক—'

—'তাই না কি? তবে যে বড়—'

—'চারু, রাখবি তোদের ফাজলামি খানিকক্ষণ? কাজের কথা হোক—ডাক বুড়িকে। ওগো—ও খুকি, কী নাম তোমার?—এলিস? বা, দিব্যি মিষ্টি নামটি তো।—এলিস, লক্ষ্মী মেয়ে, যাও তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস তো আর একবার।—কোথায় গেলেন তিনি ঘরটা দেখিয়ে দিয়েই?—সন্দীপ, বুড়ি সব টার্‌ম্‌স্‌-এ রাজি না হ'লে আবার ঘুরতে হবে অন্য রাস্তায়। কাগজখানা দে দেখি, এখানেই কাছে আর বাড়ি আছে কি না দেখা যাক!'

সুধীর বললে, 'জানিস্ চারু, ওটা হচ্ছে কায়দা—কাগজখানা হাতে নিয়ে বাড়িওয়ালিকে দেখানো যে, তোমার এখানে না হ'লেও কুছ পরোয়া নেই, আমরা মাঠে মারা যাবো না। দেখ্ আর শেখ্, তুই তো একটা হাবা, ল্যাণ্ডলেডি যখন যে-দর হাঁকে দিয়ে দিস কথাটি না ব'লে। এত বছর রইলি, "ফক্সট্রট্", "জ্যাজ্" কিছুই শিখতে বাকি রাখলি না—কেবল কারবারি-চালটুকু এদের এখনও নিতে পারলিনে?'

রাজেন হেসে বললে—'নেবে কী ক'রে? মিসেস ব্রাউনের কাছে ও যা আরামে আছে—! পাছে তাড়িয়ে দেয়—ভয়েই মরে। লুইসা ব্রাউনকে কি তাহ'লে—'

—'যাও, যাও—বাজে কথা বোলো না। মিসেস ব্রাউনরা ভদ্দরলোক, তা জানো? ওঁর স্বামী সলিসিটর ছিলেন। নেহাৎ অসময়ে মারা গিয়েই না বেচারি মিসেসকে এই বিপদে ফেলে গেছেন?—ও-বাড়ি ছাড়তে ভয় পাই তেমন ভালো লোকের বাড়ি আর পাবো না ব'লে। তোদের মতন মাসের মধ্যে বার চারেক ক'রে তো ল্যাণ্ডলেডি বদলাতে পারি না—জানিস, a rolling stone gathers no moss, তাই তো তোদের কপালে—'

—'লুইসার মতন বন্ধুনী জোটে না, না রে চারু?'

—'সুধীরটা একের নম্বর—ওঃ, এই যে মিসেস—ইয়ে—'

—'ম্যাকফার্লেন, সার্, মিসেস ডি. ম্যাকফার্লেন। তা' ঘর পছন্দ হয়েছে তো আপনাদের? যদি বলেন আরো কিছু ফার্নিচার—'

রাজেন ঘরের গাদা গাদা মান্ধাতার আমলের চেয়ার, টেবিল, সোফা-র দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভয় পেয়ে বললে—'না, না, এই বেশ আছে মিসেস ম্যাকফার্লেন, এই বেশ দেখাচ্ছে। ঘরটি আপনার চমৎকার—'

মিসেস ডি. ম্যাকফার্লেন দু হাত দুই কোমরে রেখে বুট-পরা পা-দুখানি আর একটু শক্ত করে ভূমিতে চেপে বসিয়ে ঘাড়টি পেছন দিয়ে হেলিয়ে গর্ব্বিত সুরে বললে—

'এই ব'লে দিলুম আপনাদের—মনে রাখবেন—ডি. ম্যাকফার্লেন কখনো মিথ্যে বলে ন —এমন বাড়ি, এরকম রূম কোথাও আর একখানা পাবেন না, তা সে যতই খুঁজে বেড়ান না কেন। মশায়, কাগজে বিজ্ঞাপনে অমন সবাই নিজেরটা ভালো বলে। ও-সব বিশ্বাস ক'রে ঘুরে ঘুরে বাড়ি দেখতে যাওয়া মানে মিথ্যে হায়রানি—'

সন্দীপ কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে। সুধীর কায়দা ক'রে সামনে ঝুঁকে অভিবাদন ক'রে বললে—'নিশ্চয়, নিশ্চয়, একশোবার। তাই তো বলি, কাগজে যখন পড়লুম আপনার বিজ্ঞাপনখানা—'

মিসেস ম্যাকফার্লেন একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে—'কি জানেন, ওরা ও-রকম সাত-পাঁচ বানিয়ে লেখে ব'লেই বাধ্য হ'য়ে—মিস্টার ম্যাকফার্লেন আমায় বললেন কি না —বুঝেছেন—'

রাজেন তাড়াতাড়ি বললে—'তা বই কি, এ আর শক্তটা কী বলুন'—গোপনে সুধীরের প্রতি সরোষ সকটাক্ষে—'এখন ম্যাডাম যদি অনুগ্রহ ক'রে—ভাড়া-টাড়া কত—আমাদের আবার সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে আজে-বাজে বাড়ি দেখে বেড়াতে কষ্ট হবে কি না—তাই—'

—'ভাড়া—আর কত? আমরা কখনই বিদেশীকে ঠকাই না—এজন্যে ওই পাশের রাস্তার ম্যাকডোনাল্ডরা আমায় টিটকিরি দেয় বোকা ব'লে। বলে,—বিদেশীর ওপর আবার অত দরদ কিসের? ওদের এখানে পড়তে আসা তো নয়, আমাদেরই পকেট ভর্ত্তি হওয়া ; তা নইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ডার্কিগুলোকে দলে দলে এদেশে আসতে প্রশ্রয় দিত?—আমি বলি, নাঃ—যা দর, যতটা খরচ পড়ে, তার থেকে এক ফার্দিং বেশি আমি নেব না —ওরা আমাদেরই লোক, ইণ্ডিয়া তো আর আলাদা একটা রাজ্যি নয়, কি বলেন মশায়? সত্যি বলিনি?'

সন্দীপের মুখখানা ক্রমশই লাল হ'য়ে উঠছে, এসব ব্যাপারে এদের মধ্যে সবচেয়ে আনাড়ি ও-ই। হাত দিয়ে পাশের টেবিলে রক্ষিত টুপিটা নিতে যায় আর কি—রাজেন কোন এক ফাঁকে ল্যাণ্ডলেডির চোখ এড়িয়ে আবার ওকে চোখ টিপে দেয়। মুখে বিনয়ের হাসি টেনে এনে—কারণ গরজ বড় বালাই—মিসেস ম্যাকফার্লেনকে বলে—'তা তো বটেই, তা তো বটেই—তা, এখন কত হ'লে—'

—'ভেবে দেখুন, মশাই, এই এতবড় ঘর, রোজ তাকে ঝাড়পোঁছ পরিষ্কার করা --একটা চাকরাণির কর্ম্ম তো নয়, আমাকেই দেখতে শুনতে হবে স—ব। বড় মেয়ে নেই যে সাহায্য করবে, তাই বাধ্য হ'য়ে একটা মেড্ রাখতেই হবে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত —তারপর ধোপা, ইলেকট্রিক লাইট্—এরকম সুবিধার বাড়ি আর কোথায় যে—'

সুধীর অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। যথাসাধ্য বিবক্তি গোপন ক'রে নিম্নস্বরে, যেন দরদস্তুর সংক্রান্ত কথা বলছে এমনিভাবে, বললে—'গোল্লায় যান তোমার বাড়ি আর তাঁর সুবিধা। ওহে রাজেন, এতক্ষণে সাতটা বাড়ি দেখা হ'য়ে যেত—'

রাজেন আবার বললে—'কত-র কমে আপনার চলবে না? ঘর আমাদের জন্যে নয়, আমাদের একটি বন্ধু—অর্থাৎ বন্ধুর বোনের জন্যে। কাল সকালে আসছেন তিনি।'

মিসেস ম্যাকফার্লেন আকাশ থেকে পড়ল—'তাই না কি? সেটা বলতে হয় এতক্ষণ। মেয়ে নিয়ে আবার যে-হাঙ্গামা—'

রাজেন অবাক হ'য়ে বললে—'কেন? বরং ওঁরা চুপচাপ থাকেন বেশি—হাঙ্গামা তো কমই হবার কথা—'

শ্রীমতী ঠোঁট উল্টিয়ে বললে—'ভারি তো জানেন মশায় আপনারা। ছেলে হ'লে প্রায় সারাদিনই তো বাইরে বাইরে থাকে—আমাদের তাতে সুবিধা কত। মেয়েরা যতটা সম্ভব ঘরে থাকবে, সারাদিন এ আসবে ও আসবে, এটা দাও, সেটা দাও। আমাকে তাহ'লে আবার ভাবতে হ'ল মশায়, রেট্ নিয়ে—আমি তো জানতাম না যে মেয়ে আসবে এ-বাড়িতে—'

সন্দীপ, সুধীর ও চারু হতাশ হ'য়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। রাজেন কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললে—'আমরা তবে আর দু-একখানা বাড়ি দেখিগে, একেবারে সময় নেই কি না—'

—'তা আপনাদের ইচ্ছে হ'লে যেতে পারেন,. কিন্তু আমি তো বলিনি যে ভাড়াটে বা অতিথি নেব না। কেবল বলছি এই যে মেয়ে হ'লে আর একটু বেশি খরচ পড়বে—'

—'খরচের কথা আপনি এখনো কিছুই তো বলেননি—'

—'তা দেখুন,—ইয়ে—খুব টেনেটুনে না হয় আমি তিন গিনিতে কুলিয়ে নেব—আপনারা তো আর আমাদের পর নন—বলব আমার স্বামীকে বুঝিয়ে—'

—'তি—ন গিনি? ফী হপ্তায়?—'

—'বেশি বলিনি মশায়, আমি বোকাসোকা মেয়েমানুষ—কাজ কারবার ভালো বুঝি না—মিস্টার ম্যাকফার্লেন বলেন যেখানে যাই, সেখানে হামেশাই আসি ঠ'কে—'

—'ঠ-পূর্ব্বক "কিয়ে" প্রত্যয় শ্রীমতী, "কিয়ে" প্রত্যয়, "কে" নয়'—চারু মৃদুস্বরে বাঙলায় বললে—'আহা বাছারে, গাল টিপ্‌লে দুধ বেরয় এম্‌নি ইনোসেন্ট! চল্‌রে সন্দীপ, অন্য বাড়ি দেখিগে। শা—'

—'ছি ছি, অভদ্র হ'স্‌নে চারু।—না দেখুন, আমাদের মাফ করবেন—অন্ধকার হ'য়ে আসছে। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—গুড্-বাই—'

—'গুড্-বাই সার্', দোর খুলে দিয়ে—'আড়াই গিনি হ'লে যদি পারেন তবে না হয়—আমার বড্ড কষ্ট হবে, মেড্ আর রাখতে পারব না—তবে আপনাদের খাতিরে না হয় ওতেই দেখব রাজি করতে পারি কি না আমার স্বামীকে—'

—'কিন্তু আমাদের অতক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় নেই যে! আর আমার বন্ধু আড়াই গিনিতেও রাজি না হ'তে পারেন। তাঁরা হলেন লণ্ডনের লোক, সেখানেই থাকেন দু'গিনি আড়াই গিনি দিয়ে, এর চাইতে ঢের ভালো পাড়ার ঢের ভালো বাড়িতে। এডিনবরার সবই তাঁদের চোখে অপেক্ষাকৃত খেলো ঠেকবে কি না। শেষে কি আপনাকে কথা দিয়ে মুস্কিলে পড়ব—বাড়ি তাঁর পছন্দ না হলে?'

রাজেন বন্ধুদের নিয়ে সিঁড়ির দু-এক ধাপ নেমে গেল।

—'তাহ'লে কত হ'লে আপনার বন্ধু রাজি হ'তে পারেন, সার্?'

—'এই ৩০।৩৫ শিলিং, যা রেট্ এখানকার।—তার কম কি আমরা বলতে পারি?'

ওরা আরো খানিকটা নেমে গেল।

—'৩০।৩৫ শিলিং? না, না—ম্যাকফার্লেন তাহ'লে আমায় আস্ত রাখবে না—'

—'ভারি দুঃখিত, আচ্ছা গুড্-বাই—', ওরা তড়্তড়্ ক'রে এবার অনেকখানি নেমে গেল।

—'আমি বলি কি, সার্'—ল্যাণ্ডলেডি দু'পা এগিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল।

যেতে যেতে রাজেন বললে—'কী বলছেন?'

—'দু গিনিতে হ'তে পারে, আমার স্বামী—'

—'এখানকার রেট—'

—'আচ্ছা বেশ, দু গিনি—সমস্ত খাবার, আলোর খরচ, স্নানের গরম জল—সব নিয়ে।'

রাজেন সুধীরকে বললে—'কী বলিসরে?—এর কমে রাজি হ'বে বলে তো মনে হয় না, বাগে পেয়েছে—বুঝতে পেরেছে আমাদের গরজটা—'

—'এডিনবরায়—একটা সাধারণ রুমের জন্যে দু গিনি?'

—'কিন্তু সব খাবার দেবে বলছে—'

—'সব খাবার উনি বাড়িতে খেলে তো?'

—'কোথায় খাবেন, তা না হ'লে? তোদের মতো তো আর ফট্‌ফট্ ক'রে রেস্তোরাঁয় যেতে পারবেন না ভদ্রমহিলা?—আমি বলি কি, এতেই রাজি হওয়া যাক্—এর চাইতে ভালো আর পাওয়া না গেলে মুস্কিল হবে শেষটা।'

সন্দীপ বললে—'কিন্তু বুড়িটা বড্ড ইয়ে—একেবারে ছিনে-জোঁক—'

—'আরে, ওরা সবাই ঐরকম,—ঠক্ বাছতে গাঁ—আচ্ছা—মিসেস ম্যাকফার্লেন, কাল আসব তাহ'লে আমরা—'

—'বেশ, রুম তৈরি থাকবে। একটা কথা, সার্, আপনার বন্ধু বেশ কিছুদিন থাকবেন তো?'

সুধীর চট্ করে ব'লে ফেললে—'মাস-দুই তো বটেই, বেশিও হ'তে পারে।'

বাইরে এসে সন্দীপ বললে—'অমন কথা দিলি কেন, সুধীর? উনি যদি অতদিন না থাকেন—শেষটায়?'

—'বললাম—তা নইলে বুড়ি আবার আর একটা ফ্যাসাদ বের করত, দেখেছে কি না আমরা একটু নরম হ'য়ে এসেছি।—হয়েছে কী তাতে? হপ্তাহিসেবে বন্দোবস্ত, হপ্তাখানেকের নোটিশ দিয়ে চ'লে যাবেন। আইনত বুড়ি কিছু বলতে পারে না তাতে।'

চারু বললে—'একটা রুম দেখতেই গলদঘর্ম্ম, বোঝো এখন মিসেস ব্রাউনের একটু-আধটু আব্দার কেন সহ্য করি। চক্রী মন তোমাদের, তাই সোজা কথা বিশ্বাস করতে চাও না—'

সুধীর মুচ্‌কে হাসলে। সন্দীপের চোখ রাস্তার দুধারে এটা ওটা দেখছিল। হঠাৎ

সামনের একটা বাড়ি দেখিয়ে বললে—'ঐ দেখ্ ঘর খালি আছে। চল্ না একবার দেখা যাক্।'

চারু বললে—'এক জায়গায় কথা দিয়ে ফেলে?'—

সুধীর প্রতিবাদ করলে—'তাতে হয়েছে কি? আরো ভালো আর সস্তা যদি পাই আমরা—কি বলো রাজেন?'

—মন্দ কি, দেখতে ক্ষতি নেই। সুবিধামতন হ'লে, সকালে উঠেই বুড়িকে একটা খবর দেওয়া যাবে।'

বাড়ির সামনে বাগান। বাগানের বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বাড়িটা একবার দেখে নিলে ওরা। বেশ পছন্দ হ'ল—মার্চ্চমণ্ট রোডের বাড়ির মত ব্যবসাদার ল্যাণ্ডলেডির নয়, আর, একটু ভদ্রগোছের—মধ্যবিত্ত পরিবারের ব'লে বোধ হ'ল।

ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে এসে ঘণ্টা বাজালো রাজেন। বেশিক্ষণ না যেতেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেড্ এসে দোর খুলে জিজ্ঞেস করলে—'কি চাই আপনার?' অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি রাজেন কোন্ দেশী। বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, রাস্তার উপর।

—'কর্ত্রীকে ডেকে দেবে একবার?'

—'রুমের জন্যে কি, সার্?'

—'হ্যাঁ, রুমের জন্যে।'

মেড্টি আড়চোখে চট ক'রে একবার রাজেনের ওভারকোট আর বুটজোড়া দেখে নিলে। নিয়ে—বোধ হয় ধারণা ভালোই হ'ল—চলল খবর দিতে।

মিনিটখানেক পরে আগাগোড়া কালো-পোষাক-পরা একটি বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন পাশের বসবার ঘর থেকে।—'গ্যাসটা একটু বাড়িয়ে দাও, আইভি।—কাকে চান আপনি—', ব'লে উজ্জ্বল আলোকে ঠাহর ক'রে দেখে দু' পা পিছু স'রে গিয়ে তখন-তখনই একেবারে রাজেনের মুখের উপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। ভিতর থেকে ঠাকুরাণি আর চাকরাণির বিশ্রী প্রতিবাদ শোনা গেল আভাষে। মেয়েটি জবাবদিহি করছে মনে হ'ল দোর খুলে দেওয়ার অপরাধের।

রাস্তায় আসতেই সন্দীপ বললে—'কী?'

রাজেন টুপি খুলে চুলগুলো নেড়ে-চেড়ে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে নীরস স্বরে উত্তর দিলে—'কী আবার? কালা আদ্মি! !'

—'হুঁ।'

অপমান হজম ক'রে নিঃশব্দে চারজনে বাসামুখো।

পরদিন সকালে সন্দীপ আর রাজেন সুকুমার ও তার বোনকে রিসীভ্ করতে ষ্টেশনে গেল। সন্দীপ মেয়েদের সঙ্গে কখনো বেশি মেলামেশা করেনি, তাই বেশ একটু নার্ভাস্। কি জানি কেমন মেয়ে, ঘর তাঁর মনঃপূত হবে কি না, হয়ত লণ্ডনের 'ফ্যাশানেব্‌ল্ লেডি', এই আধ-পাড়াগাঁ সহরে তাঁর জন্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কী-ই বা করতে পারত ওরা, এ-সব বুঝবেন কি না তিনি...? নিজের মনের ভয়টার আভাষ রাজেনকে একটু

দিতেই সে কাঁধটা একটুখানি উপরে তুলে বললে—'নাচার—আমাদের যথাসাধ্য করেছি।'

সুজাতার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে কিন্তু পথেই ওদের ভয় ভেঙে গেল। নিতান্ত সাদাসিদা মেয়ে, এখনও যেন স্কুলের ছাত্রী—ফ্যাশানের ধার-পাশ দিয়েও যায় না। এডিনবরার রাস্তাঘাট দেখে ভারি খুসি, উচ্ছলিত হ'য়ে বললে—'কী চুপচাপ! লণ্ডনের হট্টগোল থেকে এসে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল! আমায় কিন্তু মেজদা, সব দেখিয়ে বেড়াতে হবে গ্লাসগো যাবার আগে—হট্ ক'রে যেতে পারবে না তা ব'লে রাখছি।'

রাজেন ও সন্দীপ প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠল—'সে কি, গ্লাসগো যাচ্ছ না কি সুকুমার?'

—'কেন, মেজদা, তুমি ওঁদের লেখনি সব কথা?'

সুকুমার দুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগল।—'আগে থাকতে বললে সন্দীপকে সঙ্গে নেয় কার সাধ্যি? এখন তোর কথা ঠেলতে পারবে না।—রাজেন, লেক্স্ দেখতে যাচ্ছি হে —গ্লাসগো হ'য়ে। প্রতুল লিখেছে ওরা অনেকে যাবে, সুজাতার বান্ধবীও কারা আছেন। তাই তো ফিরে এলাম, নইলে ছুটি না ফুরোতে এ-দিক মাড়াই আমি?'

ট্যাক্সি মার্চমণ্ট রোডে ম্যাকফার্লেনের বাড়ির সামনে এসে থামল। রাজেন কি বলতে যাচ্ছিল, সুজাতা নামবার উদ্যোগ করতে সে আগেই টপ্ ক'রে নেমে পড়ে দরজা খুলে দিয়ে স'রে দাঁড়াল। ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে মিসেস ম্যাকফার্লেন উপর থেকে হাতল ঘুরিয়ে সদর দরজা খুলে দিয়েছে।

উপরে যেতে যেতে সুজাতা বললে—'চমৎকার চওড়া সিঁড়ি তো! পথে আসতে রাস্তাও দেখলাম খাসা চওড়া আর পরিষ্কার। লোকজন কম ব'লেই কি এতবড় দেখাচ্ছিল?'

রাজেনই উত্তর দিল—'না, সত্যিই এখানকার রাস্তাঘাট সুন্দর। কত বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি দেখলেন না?'

—'আমি থাকি লণ্ডনের গোল্ডার্স্ গ্রীণে, ছোট ছোট বাড়ি সব ওদিককার, ছবির মতো সুন্দর আর ঝকঝকে। এখানে সব নতুন লাগছে। এডিনবরা যে পাহাড়ে দেশের রাজধানী, তা ওর বড় বড় পাথরে তৈরি রাস্তা আর বাড়ি দেখেই বুঝতে পারা যায়। —ব্রেকফাষ্টের পরেই বেরিয়ে পড়ব, মেজদা।'

রাজেন ল্যাণ্ডলেডিকে ডেকে সুজাতার জন্যে ভাজা ডিম আর চায়ের হুকুম দিল। পরে ওকে খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একলা রেখে তিন বন্ধুতে মাঠের দিকে ঘুরে আসতে চলল।—'সুকু, তুইও এই পাশের দোকানটায় ঢুকে কিছু খেয়ে নে।'

—'মন্দ কি। তোমরাও কিছু খাও।'

—'আপত্তি নেই, চলো এই সামনের টেবিলটায় বসা যাক।'

ওয়েট্রেস্‌কে খাবার আনবার হুকুম ক'রে আরাম ক'রে ব'সে রাজেন বললে—'এদিকে কিন্তু এক ফ্যাসাদ হয়েছে, সুকুমার। ল্যাণ্ডলেডিকে বলা হয়েছিল তোর বোন অনেকদিন থাকবে।'

—'কেন বলতে গেলে ও-রকম? একেবারে কিছু না বললেই ঠিক হ'ত।'

রাজেন ঈষৎ রাগত টোনে বলল—'না ব'লে করি কী?—যেমন তোমার বুদ্ধি। এক গঙ্গা কথা লিখতে পারলে, আর, ক'দিন থাকবেন এটুকু লিখতে কী হয়েছিল?'

সন্দীপ শুধু একটু মুরুব্বিয়ানা চালে হেসে এ-কথায় 'ডিটো' করলে।

—'আরে, অত খেয়াল হয়নি আমার। প্রথমে কথা ছিল তোদের কারো ওখানে উঠে একটু বিশ্রাম ক'রেই চ'লে যাওয়া যাবে। গ্লাসগোর ট্রেনের তো অভাব নেই—'

—'সেইটেই ভালো হ'ত—একটা রূম আমরা একবেলার জন্যে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে পারতাম, বিশেষত বসবার ঘর যখন রয়েছেই—'

—'হ্যাঁ, কিন্তু ও ধ'রে বসল যাবার আগে এখানে কি কি সব দেখবে—এই দুর্গ-টুর্গ। ইতিহাস নিয়েছে কি না—এডিনবরা সম্বন্ধে ওর ভারি কৌতূহল। সামান্য কিছু দেখতে গেলেও অন্তত দিন দুত্তিন লাগে তো—'

—'সে দু-তিনদিনের জন্যে স্বচ্ছন্দে রাণীদিদের ওখানে ঠিক ক'রে দিতে পারতাম। আসলে সুকু, তোমার সব কাজেই ও-রকম—ইয়ে ছেলেমানুষী—'

রাজেন থামিয়ে দিয়ে বললে—'থাক, থাক, বুড়িকে বুঝিয়ে বলা যাবে এখন। গতস্য শোচনা—'

সারাদিন ওরা সুজাতাকে সহরের প্রসিদ্ধ জায়গাগুলো দেখিয়ে বেড়ালে। এমন ক'রে বেড়াতে হ'লে লাঞ্চ বা চা খাওয়ার জন্যে বাড়িতে ফিরে যাওয়া চলে না, কাজেই খাওয়া-দাওয়াও ওদের বাইরেই সারতে হ'ল। কিন্তু সুজাতার দুর্গ ও প্রাসাদ এত ভালো লাগল যে, সে কেবল ঐ দুটো দেখতেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। হলিরুড প্যালেস দেখা শেষ ক'রে বিকালের দিকে আর্থার্স সীটের শিখরে উঠে, দূরে সমুদ্রের পানে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল সমুদ্র দেখতে যাবে। যে কথা সেই কাজ। মেজদাদা ওর চিরদিনই ভালোমানুষ, সন্দীপ সাথে সাথে ঘুরছে মাত্র এবং রাজেন তো ওদের দুদিন বেশি ধ'রে রাখতে পারলেই খুসি। উধাও তাই সবাই মিলে—পোর্টোবেলোয়। ট্রামের দোতলায় চ'ড়ে সন্ধ্যার ম্লান আলোতে দু'ধারের বাড়িঘর, বাগান, খোলা মাঠ দেখে সুজাতার মনে হয় —এডিনবরা এক অপূর্ব্ব রহস্যময় জায়গা। একসঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের এত সমারোহ বৃটেনের আর কোনো সহরে আছে কি না সন্দেহ। বেড়াবার উপযোগী কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা পাহাড়ে, কি দূর হ'তে দৃষ্ট শ্রেণীবদ্ধ ধূসর শৈলমালায়, বিস্তীর্ণ নদী, শষ্যপূর্ণ শ্যামল মাঠ, ছোটখাট হ্রদ—সর্ব্বোপরি এই উত্তাল সমুদ্রে, এডিনবরা নগরী সকল রকমে সম্পদময়ী। স্কটের উপন্যাস আর সহরের নিজস্ব ঐতিহাসিক গৌরব সুজাতার মনের সম্ভ্রম আরো বাড়িয়ে তোলে। প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীটে ঘুরবার সময় একদল হাইল্যাণ্ডার দেয় দেখা —ব্যাগপাইপ বাজিয়ে যাচ্ছে। ওদের সেই হাঁটুর উপরে পরা পুরোনো ধরণের পোষাক, একটুখানি পালক গোঁজা মাথার টুপির মধ্যে, ব্যাগপাইপের বিচিত্র সুর—সব মিলে সুজাতার তরুণ মনে স্কচ্‌দের সম্বন্ধে ভারি একটা রোমাণ্টিক ছায়াপাত হয়।

পোর্টোবেলোর পথে যেতে যেতে ও চুপ ক'রে এসব ভাবছে...রাজেন বললে—'আপনার দেখছি এডিনবরা খুব ভালো লেগেছে।'

—'হ্যাঁ'

—'ফিরবার পথে আবার আসবেন তাহ'লে—'

সুকুমার তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানা রাজেনের চোখের সামনে ধ'রে বললে—'ভাল প্লে আছে আজ—চলো, যেতেই হবে। গলসওয়ার্দ্দির "স্ট্রাইফ"। কবে থেকে এটা দেখতে ইচ্ছে—এমন জিনিষ না দেখে নড়ছি না এখান থেকে। কুমু, আজ আর নেমে কাজ নেই, সমুদ্র আর একদিন দেখো। চলো, ফেরা যাক।'

রাজেন ঘড়িটা দেখে মনে মনে হিসাব ক'রে বললে—'কিন্তু ঢের সময় আছে সুকুমার, এত ব্যস্ত হ'য়ো না।'

সন্দীপ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, এবার অপ্রসন্ন সুরে বলল—'কিন্তু বুড়িকে যে বলা হয়নি, তার কী? হয়ত খাবার নিয়ে ব'সে থাকবে।'

—'বুড়ি?'

—'ম্যাকফার্লেন—'

—'ওঃ—ওকে তো সেই সকালেই বলেছি যে আজ আমরা বাইরে খাবো। ওর ভারি গরজ পড়েছে কি না খাবার নিয়ে ব'সে থাকবার—বরং পয়সা বাঁচলে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে তোমায় এবং যাতে কুমুকে রোজই বেড়াতে নিয়ে যাও সেই উপদেশ দেবে—'

সন্দীপের মুখটা লাল হ'য়ে উঠল। হাজার চেষ্টা ক'রেও বেচারি এ পর্য্যন্ত একবারও মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেনি। সুকুমার প্রমুখ বন্ধুরা তাই সুবিধা পেলেই ওকে চিমটি কাটতে ছাড়ে না।

পোর্টোবেলো থেকে ফিরে বেশ ভালোমত ডিনার খেয়ে থিয়েটারে যেতে ওদের একটু দেরি হ'য়ে গেল। সুকুমার কিন্তু নাছোড়বান্দা, বেশি দাম দিয়ে হ'লেও টিকিট কিনবে —অর্থাৎ গলসওয়ার্দ্দির ডাকসাইটে 'স্ট্রাইফ' না দেখে ছাড়বেই না। দলে প'ড়ে সন্দীপের পড়াশুনা ঘুচে গিয়েছে, দু-একবার শেষ চেষ্টা ক'রে সেও হাল ছেড়ে দিলে।

প্রায় রাত এগারোটায় হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রাজেন ঠাহর ক'রে দেখল সুজাতার চোখের কোল ভিজে আছে।—'এ কি, আপনি এত ছেলেমানুষ? ছি, ছি। থিয়েটার দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন?—বাঃ, যুদ্ধে হারল তো দুজনেই—বেশ তো শোধবোধ—'

সুকুমার ফিরে চেয়ে বললে—'কে, কুমু? ও ঐরকম,—থিয়েটার দেখে কাঁদে, ছবি দেখে কাঁদে। কোনো ট্রাজেডি হ'লে ওকে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না—অথচ ট্রাজেডি দেখতেই ওর লোভ বেশি।—না, না, চলো ওকে দিয়ে আসি আগে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।' সন্দীপকে ফিরিয়ে মার্চ্চমণ্ট রোডের রাস্তা ধরল সবাই।

বাড়ির সামনে এসে ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে রইল, সুকুমার সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে সুজাতাকে ম্যাকফার্লেনদের দরজাটা দেখিয়ে দিয়েই নেমে গেল। সারাদিন হৈ চৈ করা গেছে, এখন সকলেই বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে।

একটি ছেলে এসে সুজাতাকে দোর খুলে দিয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে সুজাতা দেয়াল হাৎড়ে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালালে। পরে সোফায় ব'সে জুতোটা খুলতে খুলতে

কত কি ভাবতে লাগল। চোখে ওর তখনো স্বপ্নের মায়া—মনের উপর আবেশ জড়িয়ে আছে। আর্থার্স সীট, হলিরুড, হাইল্যাণ্ডার—'স্ট্রাইফ' প্লে—সুন্দরী এডিনবরা, কোথায় দেশের নাটুকে অভিনয়, আর কোথায় এদের সুন্দর সম্ভ্রান্ত সংযত অভিনয়...আহা, অত দুঃখে প'ড়েও স্ত্রীকে হারিয়েও শ্রমিক রবার্ট—

টক্—টক্। দরজায় টোকা। সুজাতা চম্‌কে ওঠে। টক্—টক্। আর একটু জোরে। ও উঠে দরজাটা খুলে দিল।

—'কে? ও, মিসেস—কী চাই?'

মিসেস সোজা ঘরে ঢুকে সুজাতার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে বললে—'বিল—আমার ঘরের ভাড়া দাও।'

—'সে কি, এত রাত্তিরে?'

—'হুঁ, এত রাত্তিরে ব'লেই তো।' গলাটা আর একটু চড়িয়ে—'কেমন মেয়ে গা তুমি? এসেছ সেই ভোরবেলায়—সারাদিন উড়ে উড়ে কোথায় যে রইলে—ফিরলে নিশুত রাতে—কোথায় আমার ভাড়া দেওয়া, কোথায় কি!'

সুজাতা নরম সুরে বললে—'বেশ তো, আমি কি রাত্তিরেই পালিয়ে যাচ্ছি, মিসেস—ইয়ে—'

মিসেস ইয়ে কিন্তু ওকে একটুও সাহায্য করলে না। বরং রুখে উঠে বলল—'আগাম দিতে হবে—তুমি সুবিধার লোক নও—সে আমি টের পেয়েছি। নইলে এত রাত্তিরে বাড়ি আসো ছেলে সঙ্গে ক'রে?'

—'কী?'—নিমেষে স্বপ্ন ছত্রাকার। হায় সার ওয়াল্টার স্কট!

—'বড় যে তেজ দেখাও আবার? দাও আমার টাকা। টাকা না দিয়ে ও-সব—আমার বাড়িতে চলবে না—'

—'চুপ!'—সুজাতার মাথাটা চন্ ক'রে উঠল। 'জানো তুমি কী বলছ? সকালে আমার ভাইকে দেখনি?'

—'আ—আমার ভাই রে! অমন ভাই গণ্ডায় গণ্ডায়—'

মোজা পায়েই সুজাতা ওঠে লাফিয়ে : কম্পিত আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে বললে—'যা—ওঃ এখনি।'

ল্যাণ্ডলেডি কোমরে হাত দিয়ে মেজেতে গোড়ালি দিয়ে আঘাত ক'রে বললে—'ঘর তোমার যে যাব?'

—'আমি যখন ভাড়া নিয়েছি তখন আমার—এখনই বেরিয়ে যাও। আমি ঘুমব।'

—'ভাড়া দিয়েছ কি যে ঘর তোমার বলছ?'

—'কাল সকালে পাবে—এখন আমায় বিরক্ত কোরো না।' সুজাতা শাড়ি খুলে ড্রেসিং-গাউন পরল।

—'কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না, এক্ষনি চাই টাকা—নইলে কেমন ঘুমও তুমি দেখব।'

—'কী? আচ্ছা, এই আমি চললাম ঘুমতে।' সুজাতা খাটের দিকে এগুলো। মিসেস ম্যাকফার্লেন দ্রুত এসে জোরে ওর বাহু টিপে ধরল। ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে

দাঁতে দাঁত চেপে সুজাতা বললে—'How dare you?'—রাগে ওর কথা বেরুচ্ছিল না—'এর পরে একটা পেনিও না—যতক্ষণ—ক্ষমা না চাও।'

—'বটে?—ড্যাডি, ড্যাডি!'

—'কী গো, কী গো?' রান্নাঘর থেকে ভারি গলায় আওয়াজ এলো।

—'এস তো একবার এদিকে। শোনো কথা ব্ল্যাকির—বলছে দেবে না ভাড়ার টাকা। কম বুকের পাটা নয়—এতটুকু মেয়ে, হুমকি কত!' মিষ্টার ম্যাকফার্লেন পাইপ-হাতে উঠে এলেন—'হুম, লোক চেননি এখনো? ভালো চাও তো টাকা বের কর।'

যতই বাড়াবাড়ি করছে ওরা, ততই সুজাতার মাথাটা আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। ধীরে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে—'পৌনে বারোটা। মিসেস যেই-হও-না-কেন-তুমি, শোনো—দুপুর রাতে পুরুষ ডাকিয়ে জুলুম করছ বিদেশী মেয়ের ওপর টাকার জন্যে। আমার ভাই থাকতে বলোনি—ভয়ে, আর বেশি পাবে না ব'লে—'

কথা না ফুরোতে মিসেস ম্যাকফার্লেন কর্ত্তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললে—'ওঁর ভাই—'

সুজাতা ঘাড় বাঁকিয়ে দীপ্ত ভঙ্গীতে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে জানলার কাছে গিয়ে কাচটা তুলে ধরল।

শ্রীমতী পিছন পিছন এসে জিজ্ঞেস করলেন—'কী করছ শুনি?'

—'পুলিশ ডাকব—ঘর চড়াও হ'য়ে শাসাচ্ছে তোমার স্বামী—'

—'পুলিশ ডাকবে? খবরদার!' ওর হাত চেপে ধরে আর কি—সুজাতা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে সোফার ওধারে স'রে গেল। 'বেরিয়ে যা—ও বলছি, নৈলে—'

—'ড্যাডি, এ যে বিষম মেয়ে গো! দাও তো জানলাটায় খিল লাগিয়ে—', কর্ত্তার কথাবৎ কার্য্য। তারপর কর্ত্রীর সুর আর এক পর্দ্দা ওঠে।

—'ভালো চাও তো টাকা বের করো, শুনছ গা মেয়ে? নৈলে যা হাল করব তোমার—সে আমিই জানি—', স্বর ওর ফুঁসিয়ে ওঠে যেন—'পুলিশ ডাকবে? পুলিশ?—হা—হাঃ! পুলিশ কোন দেশী, সে খেয়াল আছে? ব্ল্যাকির হ'য়ে কথা বলবে নাকি সে? হা—হাঃ!'

—'বেশ তো, খুন করতে পারো, কিন্তু টাকা পাবে না। আগে মাফ চাইবে—তার পর অন্য কথা। এই দেখ, পার্সে আমার কয়েক শিলিং বৈ নেই। আমি চেক্ না লিখলে তোমাদের সাধ্যিও নেই টাকা আদায় করবে জোর ক'রে। এই আমি বসলুম এখানে—যা পারো করো এখন তোমরা।'

কী ঢ্যাটা মেয়ে গো! এতটা বয়স হ'ল, এরকম তো আর দেখিনি!' বুড়ি তাকায় বুড়োর পানে।

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেছে রান্নাঘরে, পরামর্শ করতে বুঝি....সুজাতা চুপ ক'রে ব'সে...বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ওর এতটুকু ভয় নেই। কিন্তু ভিতরে প্রতি রক্তের কণা ত্রস্তও বটে, মরীয়াও বটে—সেই সঙ্গে ঘৃণাও দুঃসহ, বিস্ময়ও। হৃৎপিণ্ডটা ওর যেন তোলপাড় ক'রে বেড়ায় প্রতি পঞ্জরে হানা দিয়ে দিয়ে। কত কী ভাবনা যে...ঘুমের আশা দুরাশা...চোখে-মুখে খানিক ঠাণ্ডা জল দিয়ে জোর ক'রে নিজেকে একটু শান্ত ক'রে উঠে

সুটকেসটা খুলে একটা বই নিয়ে বসল—রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক তো কোনোমতে। সবে বইটা খুলে ধরেছে, বুড়ি হাঁ—হাঁ ক'রে ছুটে এসে পট্ ক'রে বাতিটা দিলে নিবিয়ে।

দোরটা খুলে রেখে রান্নাঘরে গিয়ে ফের ওরা পরামর্শ করতে লাগল বুঝি।—কে জানে—মরুকগে—সুজাতা টেবিলে মাথা রেখে ভাবে।...ভাবে আর ভাবে—অন্ধকারে...

খানিক পরে ম্যাকফার্লেন এসে বাতি জ্বালিয়ে বলে—'কই, দাও তোমার লাভারের—'

—'সাবধান—কাছে এসো না!' গায়ে ওর মদের গন্ধ...

—'তোমার ভাই, না প্রিয় কার ঠিকানা—'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে—'কই, দাও না গা—'

—'কেন?'

—'কেন?' ম্যাকফার্লেন কুৎসিত হাসল। 'ডেকে আনব তাকে—দেখি সে পয়সা দেয় কি না।'

সুজাতা একটু ভাবলে। না—মেজদার আসাই ভালো। সারারাত এ মদ্যপের ঘরে একলা—সবে তো সাড়ে বারোটা বেজেছে। উঠে গিয়ে একটুক্‌রো কাগজে সুকুমারের ঠিকানা দিলে লিখে।

—'তুমি ব'সে থাকো যেমন আছ তেমনি, বুঝেছ?—খবরদার. দোর বন্ধ করতে পারবে না।'

রাতকাপড়ের উপর কোনোমতে দিনের ওভারকোটটা জড়িয়ে সশব্যস্তে সুকুমার এবং ওর পিছন পিছন সন্দীপ এসে দাঁড়াল। সুকুমার ঘরে ঢুকে বললে—'কি রে কুমু, কী ব্যাপার?'

সমস্ত শুনে বললে—'ম্যাকফার্লেন গিয়ে আমায় বললে কি, তোমার বোন আমাদের একটা পেনিও ভাড়া দেবে না বলেছে। আমি তো শুনে অবাক। তারপর মনে হ'ল নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে।' ফিরে ম্যাকফার্লেনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে—'আজ রাত্রে একটি পয়সাও পাবে না। কাল হিসেব হবে।—কি রে কুমু, তোর এখানে শুতে ভয় করছে?'

—'বড্ড, মেজদা! এরকম লোক আমি জীবনে দেখিনি, শুধু বইয়েই পড়েছি—'

—'বইয়ে কি আর শুধু শুধু লেখে রে? সত্যিকার জীবন কত কুৎসিত,—কত রকমারি স্পেসিমেন আছে যে এ-চিড়িয়াখানায়—দেখ্—দেখে শেখ্। শিখতেই তো এসেছিস এখানে।'

সন্দীপ বললে—'এসব দেখতে বা শিখতে যে হবেই তার কী মানে আছে, সুকুমার? সবাইকার এরকম অভিজ্ঞতা হয়ও না—কি ক'রে ভয়ানক খারাপ লোকের হাতে প'ড়ে গেছেন উনি—তাই তো—'

ওরা চলতে উদ্যত হ'তে ল্যাণ্ডলেডি এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল। 'যাচ্ছ যে বড় ভাড়া না দিয়ে?'

সন্দীপ এগিয়ে এসে বললে—'তোমার সঙ্গে কি চুক্তি হয়েছিল যে, ভাড়া আগাম দিতে হবে?'

—'তুমি কেন কথা বলতে আসো বাপু গায়ে প'ড়ে? তুমি কোথাকার কে শুনি? —তোমার সঙ্গে কোনো কথাও হয়নি।'

—'তা না হ'তে পারে—কিন্তু কাল বাড়ি ঠিক করবার সময় আমিও ছিলাম। সাক্ষী আছি সব কথাবার্ত্তার। মিসেস ম্যাকফার্লেন, তোমাদের ব্যবহার চূড়ান্ত নমুনা বটে। তুমি জানো কার সঙ্গে কি বলেছ? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট—'

সুজাতা ছাতা নেবার অছিলায় পিছন ফিরে দাঁড়াল। সুকুমার কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলে। মনে মনে সন্দীপের মুণ্ডপাত ক'রে জনান্তিকে সুজাতাকে বললে—'সন্দীপটা এখনও সেই আনাড়ি-ই র'য়ে গেল! কোথায় কার সঙ্গে কি বলছে দেখ্।'

বলতে না বলতে মিসেস ম্যাকফার্লেন গলা সপ্তমে চড়িয়ে ভেঙালে—'আমরা থোড়াই কেয়ার করি তোমার বিশ্ববিদ্যালয় আর তার গ্র্যাজুয়েটকে। এখন যাচ্ছ যাও, কিন্তু একটা জিনিষও নিতে পারবে না। কাল টাকা দেবে, তবে জিনিষ ছাড়ব।'

রাজেনের বসবার ঘরে মস্ত আগুনের সামনে ব'সে ওরা কজনে। সব শুনে রাজেন বললে —'আমায় যদি রাত্রে একবার ডাক্‌তিস বুদ্ধি ক'রে! কাছেই তো ছিলাম, ভাই। হায়রে হায়, দুটো গিনি নাহক্ দিয়ে দিলি?'

—'বুঝতে পারিনি যে—'

—'সে চালই ওদের যদি বুঝবি তবে আর বোকামি করবে কে?—সুকু', সুজাতার পানে চেয়ে মৃদু হেসে 'আপনাকে—ইয়ে—ওরা সত্যিই কিছু করতে সাহস পেত না। এটা যে মগের মুল্লুক নয় সেটা ওরা ভালো ক'রেই জানে। কেবল ফাঁকতালে টাকাটা নিলে মেরে। ঘরভাড়াও দিতে হ'ল না, খাবারও না, না লাইট-খরচ—না কিছু। ভয় দেখিয়ে, অপমান ক'রে রাত্রে বের ক'রে দিল ইচ্ছে ক'রেই। কিন্তু জিনিষপত্র রেখে দিলে ধ'রে। জানে যে আপনি কিছুতেই আর ওখানে যাবেন না, কিন্তু ঘর-ভাড়াটা—চুক্তির সব টাকাটা, তাও সারা হপ্তার অর্থাৎ পুরো দুটো গিনি—বাধ্য হ'য়েই দিতে হবে। তুখোড় লোক, পাকা চালিয়াৎ আর ভারি লো-ক্লাস। জানেন, Foxy কথাটার বাংলা করেছি আমি শেয়ালিয়ানা—নৈলে এদের ব্যাখ্যানা করা যায় না। ষ্টুডেন্টরা যে এই সামান্য টাকা নিয়ে হাঙ্গাম করতে চাইবে না, তা ওরা বেশ জানে।—কিন্তু তুই সন্দীপ, কী ব'লে কলকাতা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটসিপএর দোহাই দিতে গিয়েছিলি, হ্যাঁরে ইডিয়টস্য ইডিয়ট?'

লজ্জায় সন্দীপের মাথাটা টেবিলের সঙ্গে প্রায় এক হ'য়ে যায় আর কি। সুজাতার দিকে সে তাকাতে পারে না। সুজাতার মুখও লাল হ'য়ে ওঠে।

সুকুমার হাসে—'কী ভাবছিস কুমু?'

সুজাতা অধোমুখ সন্দীপের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলে—'একটা গান শুনেছিলাম মেজদা—

"বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রূপোর নয়।" '

নীল রক্ত *

জ্যোৎস্না বাপের একমাত্র মেয়ে। ওর বাবা সাবেক-কালের অভিজাত মানুষ, এবং সেরকম লোকদের সচরাচর যা হয়—মনটাও ভারি সাদাসিদে। কিন্তু কৌলীন্য-গর্ব্বে একেবারে আকণ্ঠ মগ্ন। ওঁর স্থিরবিশ্বাস, উচ্চবংশের লোকের স্বভাবচরিত্র অতি উচ্চাঙ্গের না হ'য়েই পারে না। তাই জ্যোৎস্নাকে যখন বিলেত পাঠালেন, অভিভাবক ঠিক ক'রে দিলেন এক প্রাচীন বংশের অশীতিপর স্কচ মহোদয়কে, বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন যেন একটু কষ্ট ক'রে দেখেশুনে রেণুকে কোনো মার্জ্জিতরুচি সদ্বংশজাতা মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখা হয় —যেখানে সে ঘরের মেয়ের মত যত্ন পাবে এবং ভদ্রপরিবারের ভদ্র ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে ইংলণ্ডের কাল্‌চারটুকু নখদর্পণস্থ ক'রে দেশে ফিরতে পারবে। তারজন্যে খরচপত্র একটু বেশি হ'লেও ক্ষতি নেই, কেবল মেয়ে যেন হা-ঘরেদের কবলে না পড়ে। বৃদ্ধ হ্যালিডে সাহেব উত্তরে লিখলেন যে মেয়ের জন্যে চাটার্জ্জির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা জ্যোৎস্নার মোটের উপর ভালোই।

হ্যালিডে-বাড়ির সব-ছোট ছেলে, ষোলবছর বয়সের শান্তদর্শন রবার্ট ওরফে ববী, ভিক্টোরিয়ায় একা দাঁড়িয়ে। জানলা থেকে জ্যোৎস্নার উদ্বিগ্ন মুখ প্ল্যাটফর্মে উঁকি দিতেই কাছে গিয়ে নম্রভাবে বললে, পিতার আদেশে সাউথ কেনসিংটনে নিজেদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যেতে এসেছে। দেখেশুনে জ্যোৎস্নার মনে হ'ল—শক্তটা কী? এ তো ঠিক এক কলকাতা থেকে আর এক কলকাতায় আসা। এই যদি বিলেত, তবে লোকে এত ডরায় কেন কালাপানির নামে?

বাড়ি পৌঁছতেই হ্যালিডে-ঘরণী এসে অতি যত্ন ক'রে হাত ধ'রে বসবার-ঘরে ওঠালেন। দুচারটি খুচরা কথাবার্ত্তার পর—যদিও ভর্ত্তা সেখানে বসেছিলেন, তবু তাঁর হ'য়ে কর্ত্রী বললেন,—'তোমার জন্যে আমরা নর্থ-ওয়েষ্ট অঞ্চলে বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি।'

—'বাবা যেরকম চান সেরকম তো?—দেখবেন—শিক্ষিত, ভদ্র—?'

—'তাতে সন্দেহ নেই, কি বলো হ্যারি?'

হ্যালিডে বললেন—'অবধারিত। যদিও আমরা তাঁদের চিনি না, কিন্তু এত চিঠি-লেখালেখি হয়েছে যে—এই দেখুন না মিস্—'

জ্যোৎস্না সবিনয়ে বললে—'আমাকে জ্যোৎস্না ব'লেই ডাকবেন আপনারা—'

মিসেস হ্যালিডে বিপন্নমুখে শুধোলেন—'জ্যোৎ—? কিন্তু তোমার বাবা "রেণু" লেখেন কেন? তোমাদেরও দুতিনটে নাম থাকে বুঝি, যেমন আমাদের—ইসাবেল লুসি মেরিয়া—ধরণের?'

জ্যোৎস্না হেসে বললে—'না—অত ঘটা নেই আমাদের—আমার ভালো নাম জ্যোৎস্না-রাণী, রেণু শুধু ডাক-নাম—'

—'ওঃ বুঝেছি, এই যেমন রবার্টকে আমরা "বব্—ববী" ব'লে ডাকি—বুঝেছ,

* 'Blue blood'—বিলিতি অভিজাতের দেহে লাল রক্ত বয় না, ওরা বলে।

হ্যারি? আদরের নাম। কিন্তু তুমি যাঁদের বাড়িতে যাবে আজ খাওয়াদাওয়ার পরে, তাঁদের কাছে শুধু একটা নামেরই চল রেখো—তোমার বাবাকেও বোলো তা-ই করতে।'

হ্যালিডে বাধা দিয়ে বললেন—'তারপর কি বলছিলাম শোনো। "রীড বাক্‌লি"রা থাকে হ্যাম্প্‌ষ্টেড অঞ্চলে—বেল্‌সাইজ্ পার্কে। এককালে খুব অবস্থাপন্ন ছিল। কোন্ এক কোম্পানীকে অনেক টাকা ধার দিয়ে সেটা হঠাৎ ফেল পড়ার পর থেকে একটু—ওর নাম কি—তাই বাড়িতে একজন পেয়িং গেষ্ট্ রাখতে চায়—'

—'আপনাদের চেনা লোক যখন—'

—'না—চেনা লোক—ওর নাম কি, ঠিক নয়, কিন্তু ঐ হ'ল বৈ কি। সব খবর নিয়েছি তন্ন তন্ন ক'রে। আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারলে একবার দেখা ক'রে আসতাম—মিসেস হ্যালিডেও বাতরোগে—কিন্তু তবু এই দেখ না কত খবর নিয়েছি—'

—'শুধুই চিঠি-পত্রে?'—জ্যোৎস্নার মনটার মধ্যে কোথায় যেন একটা কিন্তু-ভাব আসে।

—'হ্যাঁ, কিন্তু ইংলণ্ডে তা সামান্য ব'লে মনে কোরো না। রীতিমত ভদ্রলোক—অভিজাত—যাকে জেন্টল্‌ম্যান বলি আমরা। কী পরিষ্কার ইংরিজি লেখে দেখ। আমি বলেছিলাম কিনা যে, তোমাকে বিশুদ্ধ ইংরিজি শেখানো চাই—যে-সে-বাড়িতে গেলে—ওর নাম কি—যেমন-তেমন উচ্চারণ শুনে অভ্যেস যায় বিগড়ে। কেবল তুমি—অর্থাৎ—তোমাদের দেশের স্বাধীনচেতা লেডিদের মত যখন-খুসি বাড়ি-টাড়ি বদলাতে পারবে না তা আগে থেকে ব'লে রাখছি। আমাকে জানিয়ে করতে হবে স—ব।'

শুনে জ্যোৎস্নার কানের কাছটা গরম হ'য়ে ওঠে, কিন্তু উপায় নেই কিছু বলবার।

হ্যালিডে আবার বলতে লাগলেন—'রীড বাক্‌লিদের পরিচয় শোনো। স্বামী স্ত্রী, তিনটি ছেলে। বড়টি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে কাজ করে—'

মিসেস হ্যালিডে বিস্ময়সূচক একরকম ননডেসক্রিপ্ট্ শব্দ ক'রে বললেন—'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে? তাহ'লে সত্যি জেন্টল্‌ম্যান'—

—'তা না তো বলছি কি?—ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে কি আর যাকে-তাকে কাজ দেয়?—কী বলছিলাম?—হ্যাঁ, তারপর মেজ ছেলে কাজ করে রয়্যাল ম্যারিনে—লেফটেনাণ্ট হ'ল ব'লে ; আর—ওর নাম কি—ছোটটি পড়ে অক্সফোর্ডে। ছেলেরা মাঝে মাঝে বাড়ি আসে, তা না হ'লে বুড়োবুড়ি আর চাকরাণি ছাড়া অন্য কেউ নেই—ঠিক আমি যা চাই, বুঝেছ তো এলিজাবেথ?'

মিসেস হ্যালিডে ঘাড় নেড়ে জানালেন—ঝাপসা নেই কিছুই তাঁর কাছে। তারপর জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে—'তুমি নিঃশঙ্কে যাও সে বাড়িতে—মাই ডিয়ার—কিছু মনে কোরো না, আমরাও তোমাকে রেণু ব'লেই ডাকব। সবই তো ঠিক হ'য়ে গেল আর কি, আজকের লাঞ্চটা এখানেই সেরে নাও। মাড্রাস কারি রান্না হয়েছে তোমার জন্যে—আমাদের কুকটা ছিল কি না তোমাদের দেশে—একটা হোটেলে।—খাওয়া-দাওয়ার পরে বব্ রেখে আসবে তোমায়।'

জ্যোৎস্না বেল্‌সাইজ্ পার্কে এসেছে আজ তিনদিন, বিকেলবেলা উপরে শোবার ঘরের

জানলার কাছে ব'সে অন্যমনস্কভাবে বাইরে বাগানের দিকে চেয়ে আছে। থেকে থেকে শীতে শরীরটা কেঁপে উঠছে, পায়ের উপর পা ঘ'সে একটু গরম হবার চেষ্টা করছে এক একবার—কিন্তু উঠে গিয়ে বিছানার পাশ থেকে গরম 'রাগ'-টা এনে পা-দুটো ঢাকা দেবার উদ্যম কই মনের মধ্যে? ব'সে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবছে। এই দিনতিনেকের মধ্যে এখানে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে যাতে ওর আটপৌরে মনটা যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছে।—বব হ্যালিডে তো সেদিন ওকে এ বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই চম্পট—মিনিট পাঁচেকও দাঁড়াল না, একলাই বাড়ীর কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ সারতে হ'ল ওকে। অতি দীর্ঘ—ছফুট?—হবে বৈ কি। শুক্নো বটের জটের মতো চেহারা মিসেস রীড বাক্লির। স্বয়ং সদর-দরজা খুলে ভারিক্কি চালে—সম্ভ্রান্ত গমকে শুধালেন—'কী প্রয়োজন, কাকে চাই?'—

—'মিষ্টার হেনরি হ্যালিডের কাছ থেকে আসছি—আমি—ইনি মিস চাটার্জ্জি—আজকে যাঁর আসবার কথা ছিল—'

—'ও, ভেতরে এসো—রোসো, বাইরে জুতোটা ঝেড়ে নাও আগে ; ব্যস্—এবার আসতে পারো। না না—ছাতাটা রাখো ওখানে। মাদলীন!'

—'মাদাম!'—একটি মোটাসোটা হাস্যমুখী যুবতী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো নিচের রান্নাঘর থেকে।

মিসেস রীড বাকলি জ্যোৎস্নাকে দেখিয়ে বললেন—'তেতলার ঘরে নিয়ে যাও—পেছনেরটায়।' অতঃপর জ্যোৎস্নার দিকে ফিরে—'ওপরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হ'য়ে এস গে,—ঠিক চারটেয় চা—মিষ্টার রীড বাকলি একমিনিটও এদিক-ওদিক হওয়া পছন্দ করেন না। নয়ত বলো—মাদ্লীন চা তোমার ঘরেই দিয়ে আসবে,—কিন্তু সেটা তোমার অভিভাবক চান না—তিনি বলেছেন তোমাকে আদব-কায়দা শেখাতে—তবে আজকের দিনটা আমি—'

জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বললে—'কিচ্ছু দরকার নেই চা ওপরে পাঠাবার—আমি এক্ষুনি তৈরি হ'য়ে নিচ্ছি।'

—'সে-ই ভালো—আমি সব বিষয়ে নিয়ম মেনে চলতে ভালোবাসি—যেমন কথা তেম্নি কাজ—ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারে কথার নড়চড় হবার জো-টি নেই—'

ভয়ে আর ভক্তিতে জ্যোৎস্নার প্রায় দম বন্ধ হয় আর কি! ভয়—এই অভিজাত-গৃহিণীর সঙ্গে সব সময় তাল রেখে চলতে পারবে কি না। ভক্তি—এঁদের উচ্চ নীতিজ্ঞান, উঁচু চালচলনের বহর দেখে। নাঃ—হ্যালিডে জ্যোৎস্নাকে নেহাৎ জলে ফেলেননি তাহ'লে—যদিও বৃদ্ধবয়স আর বাতের দোহাই দিয়ে—না মিষ্টার, না মিসেস কেউ একবারও বাড়িটা বা বাড়ির কর্ত্রীকে নিজের চোখে দেখতে এলেন না—তবে এটাও বোধ হয় এপারের অভিজাতদের কায়দা —এটিকেট! ববী হ্যালিডে তো ছেলেমানুষ—চট্ ক'রে চ'লে যাওয়ার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।...যাহোক—জ্যোৎস্না কী ভুলটাই করেছিল মনে মনে ক্ষুণ্ন হ'য়ে যে, ওঁরা ওকে না দেখেশুনে একটা আজগুবি জায়গায় একলা পাঠাচ্ছেন। ওর ভেবে দেখা উচিত ছিল যে এটা হচ্ছে ইংল্যাণ্ড—আছে সে জগতের

সেরা সহর লণ্ডনে, যেখানে তারে-বেতারে বিশ্বভৌম খবরের লেন-দেন হ'তে পারে ঘরে ব'সেই—বাত বা বার্দ্ধক্য নামঞ্জুর। হ্যালিডেরা ঠিকই বলেছেন—এরা সত্যিকার জেণ্টল্‌ম্যান, ঘরদুয়ার তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করছে বটে। মাদলীনের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জ্যোৎস্না চম্‌কে চম্‌কে ওঠে, ভাবে, আর মনটা হাল্কা হওয়া উচিত ভেবে প্রসন্ন হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করে।

ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আধ-আধ ইংরিজিতে মেড বললে—'তবে আমি এখন যাই, মাদ্‌মোয়াসেল্?'

জ্যোৎস্না আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—'তুমি ইংরেজ নও?'

রক্ত অধর ফুলিয়ে হাত নেড়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে মেড সাফ্ জবাবই দিল—'ইংরেজ হ'তে যাবো কোন্ দুঃখে? ওরা জানে কী? রান্না যা করে—'

জ্যোৎস্না হাসি চেপে বাধা দিয়ে বললে—'থাক্—কিন্তু তুমি তবে কোন্ দেশী?'

—'বেলজিয়ান মাদ্‌মোয়াসেল্—খাঁটি বেলজিয়ান। সাধ ক'রে এইছি এ পোড়া ইংরেজদের দেশে? পেটের জ্বালায়—', মুখ সাম্‌লে নিয়ে বললে—'ঐ কোণে আপনার মুখ ধোবার জল, তোয়ালে, সব সাজানো। ঘণ্টা বাজতে শুনলেই উঠি-পড়ি ক'রে নিচে ছুটবেন কিন্তু, একমিনিট দেরি না হয়, নইলে—', মুখভঙ্গি ক'রে বাকি কথাটা উহ্য রেখেই বুঝিয়ে দিলে।

জ্যোৎস্না হেসে ফেলল—'আচ্ছা, কিন্তু খাবার-ঘর কোন্‌টা চিনব কী ক'রে? এখনো তো এ-বাড়ির কিছুই জানি না।'

—'খাবার-ঘরে! Mon dieu!—রীড বাক্‌লিরা চা খাবে খাবার-ঘরে? আপনি বলছেন কি?'

জ্যোৎস্না অবাক হ'য়ে গেল—'কেন? এমন কী বেফাঁশ বললাম—'

—'বেফাঁশ নয়?—বাঃ—এঁদের যে সব বনেদি চাল!...শোনেননি?—কার বংশধর ওঁরা?'

—'তার মানে?'

—'শুনবেন আস্তে আস্তে, থাকুন তো দিনকতক!'

জ্যোৎস্না এত আশ্চর্য্য হয়েছিল মাদলীনের রহস্যময় কথাবার্ত্তা ধরণধারণ দেখে —এতক্ষণ ওর খেয়ালই হয়নি যে, যে-বাড়িতে থাকতে এসেছে, সে-বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে তাদেরই চাকরাণীর চুকলি-কাটা—হ্যাঁ চুকলি-কাটাই বৈ কি—শুনে যাচ্ছে এতটুকু বাধা না দিয়ে। এখন সেটা স্মরণ হওয়ায় চকিত দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—'এই যাঃ, চায়ের সময় হ'য়ে গেছে, এখনি তো ঘণ্টা বাজবে, কাপড় ছাড়বার সময়—? আচ্ছা, তুমি যাও এখন। কী নাম যেন?'

—'আমার, মাদ্‌মোয়াসেল্? মাদলীন—মাদলীন বুরিয়েন্।'

—'বিবাহিতা?'

অস্ফুটসুরে কী যেন ব'লে মাদলীন তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

ড্রইংরুমে পা দিতেই মিসেস রীড বাক্‌লি ম্যাণ্টল্‌পীসের ঘড়িটার পানে তাকিয়ে ব'লে

উঠলেন—'তোমার কিন্তু পাঁচমিনিট দেরি হ'য়ে গেছে আজ।' মিষ্টার বাক্‌লি তাড়াতাড়ি উঠে মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে অভিবাদন ক'রে একখানা চেয়ারের ডগায় হাত দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে সেটা আবার সেখানেই রেখে দিলেন ; ভাবখানা—এইটাতেই তনুরক্ষা করতে হবে তার। প্রথমটা ও বুঝতে পারেনি—পরে বুঝে সশব্যস্তে বসল। মিসেস বাক্‌লি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওর আপাদমস্তক পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বললেন—'তুমি ড্রেস বদলাওনি?'

—'সময় পাইনি। রাত্রে বদলাব।'

—'চায়ের সময় একটা হাল্‌কা রংএর চিয়ারফুল পোষাক প'রে আসা উচিত ছিল তোমার—এটার বড্ড ডীপ্‌ রং—নিশ্চয় ট্রাভেলিং গাউন, কি বলো?'

—'গাউন? না তো—এ যে শাড়ি—'

—'কী? শা—কী বললে?'

—'শাড়ি শোনেননি?—আমরা শাড়ি বলি আমাদের এরকম কাপড়কে—'

—'ও—ঈষ্টের কোন বিশেষ ফ্যাশান বুঝি?'

—'না, ফ্যাশান-ট্যাশান নেই আমাদের। সব একই রকম কাপড়—পাঁচ ছ গজের পীস্‌ এক একটা—'

—'ব্লাউজ আলাদা?'

ওর হাসি পায়—'দেখতে চান আপনি? বেশ তো, দেখাব একদিন—', মিসেস বাক্‌লি তাড়াতাড়ি—বোধহয় নিজেদের আভিজাত্য স্মরণ ক'রে—বললেন—'না না না—তোমাদের কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে অন্য কোনো কৌতূহল নেই—আমার, কেবল, এরকম আউটল্যাণ্ডিষ ধরণের পোষাক প'রে তো এ-বাড়িতে থাকা চলবে না—'

জ্যোৎস্না কণ্টকিত হ'য়ে বললে—'কী করতে হবে তাহ'লে?'

—'কালই টেলার ডাকিয়ে পোষাক করতে দেব তোমার জন্যে—'

আতঙ্কে জ্যোৎস্না চেয়ারটা ঠেলে উঠে পড়ল—'বলেন কি? না মিসেস বাক্‌লি, না—আমি কিছুতেই ফ্রক পরতে পারব না আপনাদের মত—আপনার বাড়ি থেকে চ'লে যেতে হয় সে-ও স্বীকার—'

মিসেস বাক্‌লি পিঠটা সুপুরি গাছের মত সোজা ক'রে উঁচু হ'য়ে ব'সে বললেন—'বোসো শান্ত হ'য়ে। উত্তেজিত হওয়াটা আভিজাত্যের নিদর্শন নয়, তোমায় ভারতীয় বনেদি ঘরের মেয়ে জেনেই রাজি হয়েছি বাড়িতে রাখতে। তোমার অভিভাবক বলেছিলেন যে ছেলেমানুষ প্রায় স্কুলগার্ল, গ'ড়ে-পিটে মানুষ ক'রে নিতে বেগ পেতে হবে না। তা তুমি প্রথম থেকেই এমন দুষ্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে চললে—হুঁ, তাহ'লে আমাকে বাধ্য হ'য়ে হ্যালিডে পরিবারকে সব রিপোর্ট করতে হবে।'

জ্যোৎস্না অসহায়ভাবে একবার মিষ্টার বাক্‌লির দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক যদি ওর হ'য়ে একটা কথাও বলেন! কিন্তু ওর দৃষ্টির উত্তরে কর্তা শুধু একটু ফিকে দ্ব্যর্থক হাসি হাসলেন দেখে কম্পিত কণ্ঠে বললে—'আমি সত্যি বলছি আপনাকে, আমায় কেটে ফেললেও শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরতে পারব না—মিষ্টার হ্যালিডে আমাকে জোর ক'রে বিলিতি পোষাক পরাতে পারবেন না তো!'

—'মাই ডিয়ার, তোমার কথাবার্ত্তা রা—দার ঝাঁঝালো, আর একটু নরম হ'য়ে কথা বলতে শেখো—আমাদের জেন্টল্ ব্লাডে সয় না ও-রকম—মানে অভব্য কথাবার্ত্তা।'

জ্যোৎস্নার মুখে ঈষৎ লালচে আভা দেখা দিল :

—'আমি শুধু এটুকু করতে পারি যে শাড়িখানা আর একটু উঁচু ক'রে পরব এবং গায়ের দিকে খুব টানটুন ক'রে দেব যাতে যতটা সম্ভব ফ্রকের মত দেখায়, তার বেশি না।'

—'আচ্ছা, সে তোমার অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করব'খনি, তোমার কিছু বলার দরকার নেই। মনে রেখো, তুমি এসেছ এখানে উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষা নিতে। তোমার থেকে যাঁরা বেশি জানেন শোনেন, তাঁদের বিবেচনামতই তো চলতে হবে তোমার। আর, এই দেখ, ওটা কি তোমার কানে?'

—'দুল বলি আমরা। আপনারাও তো পরেন, না? ট্রিংকেট, না ইয়ারিং কী বলেন যেন?'

—'ইয়ারিং? একে আবার নাকি আমরা ইয়ারিং বলি? ছি, ছি! এরকম অসভ্যের মত'—বোঁ ক'রে মিষ্টার বাকলির দিকে ফিরে—'দেখেছ জর্জ্জ, কানে নাকি ইয়ারিং পরি আমরা এত বড়! ঠিক কাফ্রিদের মতো রুচি। কাগজে যে পড়ি ইণ্ডিয়ান মেয়েদের বিকট বিকট গয়না-প্রীতির কথা, সব দেখছি সত্যি। কি বিশ্রী! আর কী সখ!'

বেচারি জ্যোৎস্নার সাধের ঝুমকো! কলকাতার সেরা কারিগরের তৈরি! রাগে দুঃখে ওর বুকের ভিতরটায় কী যে করে—! চা আর চোখের জলে প্রায় এক হ'য়ে যায়।

—'জর্জ্জ!—বলি, শুনছ?—আঃ!'

মিষ্টার বাকলি তাড়াতাড়ি হাতটা কানের কাছে নিয়ে ঝুঁকে ব'সে বললেন—'কী বলছ হ্যারিয়েট?'

—'তোমাকে নিয়ে যা মুস্কিল—কানের মাথা একেবারে খেয়ে বসেছ। একটা সুখ-দুঃখের কথা বলবার, ঘরগেরস্তালির আলোচনা পরামর্শ করবার জো-টি আছে? কালই যন্ত্রটা সারিয়ে এনো। বলছিলুম কি, এই মেয়ে এরকম সাজ-পোষাক ক'রে আমার বাড়িতে থাকলে ছেলেরা এলে বলবেই বা কী? আর ওর সঙ্গে মেলামেশা কবতে দিলেই বা পাড়াপড়শীর কাছে মুখ দেখাব কী ক'রে?'

মুখ যথাসম্ভব সম্ভ্রান্তভাবে মেখলা ক'রে মিষ্টার বাকলি বললেন—'তুমি কি ভাবছ এ-কথা আমারও মনে হয়নি নাকি? এমনিতেই লোকে বলাবলি সুরু করেছে পেয়িং গেষ্ট নেওয়ায় আমাদের।' একটু ভেবে—'যাক, এখন আর উপায় কী বলো?—তবে মুস্কিল এই যে, "জনি" তো ফি শনিবারেই বাড়ি আসে, এবার ক্রিসও আসবে ছুটিতে। দেখো, ছেলেরা যেন ওর সঙ্গে কোথাও বাইরে-টাইরে না যায়—এ-ছাড়া আর কী করতে পারি বলো—এখন?'

—'বাইরে?—বিলক্ষণ! শুনছ গা মেয়ে? ভালো কথা, তোমার ক্রিশ্চিয়ান নাম তো বললে না—'

জ্যোৎস্না যথাসম্ভব নিজেকে শান্ত ক'রে বললে—'ক্রিশ্চিয়ান নাম-টাম নেই, আমার হিন্দু নাম—'

—'কী জ্বালা! আদ্যনাম জিজ্ঞেস করছি—তোমার নিজের নাম—'

—'জ্যোৎস্না-রাণী, বাবার নাম—চাটার্জ্জি।'

—'দুটোর একটাও আমি উচ্চারণ করতে পারব না, সে তুমি যতই রাগ করো না কন। ছোট্ট ক'রে একটা নাম বলো—'

—'জ্যোৎস্না।' —ও অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে।

চোখ কপালে তুলে ভদ্রমহিলা বললেন—

'জটস্—না, অসম্ভব। তোমাকে আমরা ডাকতে পারি এমন একটা নাম দিতে বে...হাঁ, এই ঠিক হবে—জয়—জয়্।'

—'আমি এসে খুব তো "জয়্" হয়েছে আপনাদের! ও নাম চাইনে, রেণু ডাকতে ারেন ইচ্ছা হ'লে। বাড়িতে আমাকে ঐ নামেই ডাকেন নিকট আত্মীয়েরা।' সজোরে াড় নেড়ে নামকরণী বললেন—

'না, না, একটা ভদ্র ইংরিজি নাম চাই, নইলে আমাদের সুবিধা হবে না।' ব'লে ়সেস বাকলি এ-বিষয়ে সমস্ত আলোচনা হাত নেড়ে দাবিয়ে দিলেন।—

জ্যাৎস্না সারা সন্ধ্যাটা ব'সে ব'সে ভাবলে—'এই বুঝি এদেশের অ্যারিষ্টক্র্যাট্? আচ্ছা, ামি কি সত্যি ভারি উঁচুদরের ভদ্রপরিবারেই এসেছি? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি? একটা ানা লোক নেই ত্রিসীমানায়। হ্যালিডেরা হয়ত আরো যা তা ব'লে বসবে শনৈঃ শনৈঃ।'

ন্ধ্যা ঠিক সাতটায় রীড বাকলিরা ডিনার খেতে বসে। আধ-ঘন্টা আগে থাকতে মিষ্টার কলি পোষাক পরতে যান। ডিনার সূট প'রে নেমে আসতে সিঁড়ির নিচে জ্যোৎস্নার ঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি। ওকে দরজাটা খুলে দিয়ে নিজে একটু পরে এলেন।

শাড়ির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে জ্যোৎস্না রাগ ক'রে একটা জমকালো ময়ূরকণ্ঠী নাবসী প'রে নেমেছে। বারবার আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে মিসেস বাকলি বললেন 'পোষাকের বিষয়ে না হয় পরে বিবেচনা করা যাবে জয়, ফ্রকের মত ক'রে যদি রতে পার—'

জ্যোৎস্না আশু বিজয়ানন্দ গোপন ক'রে সংক্ষেপে বললে—'দেখি।'

—'তখন কী যে একটা রং পরেছিলে—ভারি ডিপ্রেসিং!—এটা দেখো তো জ্জ—'

বাকলি আস্কারা পেয়ে সাহস ক'রে বললে—'রোজ ডিনারের সময় যদি এরকম ় পর, ভারি খুসি হব!'

জ্যোৎস্না মনে মনে বললে—'ব'য়ে গেছে আমার রোজ ডিনারে এত হাঙ্গাম করতে, দের মন পেতে। একদিন পরেছি ঢে—র! এরকম নিদারুণ অভিজাত পরিবারে কে আমার কাজ নেই। হ্যালিডে না শোনেন তো বাবাকে টেলিগ্রাম করব।' মুখে বললে 'বিকেলেরটা বাইরে পরবার শাড়ি ছিল কিনা, গাঢ় রং না হ'লে ময়লা হবে যে শীগগির!'

—'তুমি কাপড়চোপড় বাড়িতেই ধোয়াতে পার, তার জন্যে অবশ্য একস্ট্রা দিতে ব ম্যাদলীনকে।'

—'তা তো বটেই—'

ছোট্ট কাচের গ্লাসে একটা হল্‌দে পদার্থ ঢেলে মিষ্টার বাক্‌লি জ্যোৎস্নার দিকে এগিয়ে দিলেন সুধামাখা হাসি হেসে।

—'এটা?'

—'ড্রিংক্‌। খাও, সারাদিনের ক্লান্তি চ'লে যাবে।'

—'ম—দ! কিন্তু ও আমরা সাতজন্মেও ছুঁইনে, মিসেস বাক্‌লি।' শোধ তুলল ও 'সাতজন্মে' কথাটা পাল্টে দিয়ে।

ঘরণী বিরক্তি চেপে বললেন—'আজ খেতে হয়। তুমি আমাদের অতিথি প্রথম রাতটা! না খেলে অভদ্রতা হবে।'

—'আমার অভ্যেস নেই, কিছু মনে করবেন না।'

মিষ্টার বাক্‌লির মুখটা ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন না। মিসেস বাক্‌লি কঠিন মুখে বললেন—'তুমি আমাদের আতিথ্যকে অপমান করলে? জানো—ওয়াইন আমরা যাকে-তাকে অফার করি না?'

জ্যোৎস্না সহজ অথচ দৃঢ় সুরে বললে—'আপনাদের আতিথ্যকে অপমান করবার আমার এতটুকু দুরভিসন্ধি নেই। শুধু দয়া ক'রে ভেবে দেখুন—আমি একটি বিদেশী মেয়ে, আপনাদের আদব-কায়দা আর আমাদের আদব-কায়দায় এক এক সময় আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকতে পারে। না খেলে আপনারা রাগ করছেন, খেলে আমার আজীবন সংস্কারে আর প্রিন্সিপলে আঘাত লাগবে। আমি করতে পারি এমন কোনো কাজ বলুন,—দেখবেন, আপনাদের ভদ্রতার মান রাখতে জানি কি না।'...

কিন্তু সারা সন্ধ্যাটা বাক্‌লি-দম্পতীর মুখের কাঠিন্য ঘুচল না।

রাত্রে শুতে গিয়ে কাপড় ছাড়বার সময় জ্যোৎস্নার ভারি শীত করতে লাগল। মাদলীনকে ডেকে বললে—'আমাকে একটু আগুন ক'রে দিতে পারো?'

—'পারব না কেন? কিন্তু ঠাকরুণের হুকুম লাগবে।'

—'বেশ তো, যাও না—জিজ্ঞেস ক'রে এসো।'

খানিক পরে মাদলীন এসে বললে—'মাদ্‌মোয়াসেল্‌, ঠাকরুণ বললেন কি, ঘরে আগুন জ্বালানো তাঁর ইচ্ছে নয়। আপনার যদি এ-ঘর ঠাণ্ডা লাগে, তবে দোতলার একটা ঘরে যেতে পারেন—এরই ঠিক নিচেরটা। সেখানে গ্যাস্‌রিং আছে, এব শিলিং বাক্সে ফেলে দিলেই দিব্যি আগুন পোয়াতে পারবেন। কিন্তু—'

—'কি?'

মাদলীন মুখ টিপে হেসে বললে—

—'ভাড়া বেশি লাগবে—'

—'কত?'

—'এখন যত দিচ্ছেন তার প্রায় আড়াই গুণ।'

—'বলো কি!! আগুনের জন্যে তো এছাড়া এমনিই বাক্সে শিলিং ফেলতে বলছ—তবু এত?'

—'নৈলে ভেবেছেন কি?' ওর তির্য্যক্ হাসি উদার হ'য়ে ওঠে।

—'আর, যদি না যাই ও-ঘরে তাহ'লে রাতের পর রাত এখানে হিমে ব'সে পড়াশুনো করতে হবে আমাকে—এই না কি?'

—'সেটা জিজ্ঞেস ক'রে আসছি আবার।'

জ্যোৎস্না ঠাণ্ডায় আর না পেরে বিছানার কম্বল মুড়ি দিল।

মাদলীন এসে দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—'ঠাকরুণ বলছেন—ডাইনিংরূমে প্রায় নটা পর্য্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকে। ডিনারের পর সেখানেই ব'সে পড়াশুনো করতে পারেন আপনার ইচ্ছা হ'লে।'

—'ধন্যবাদ মাদলীন। অনেক কষ্ট করেছ তুমি, এবার যাও।'

—'তা তো যাব কিন্তু কী ঠিক করলেন বলব?'

—'ঠিক কিছুই করিনি এখনো, ভেবে বলব কাল। এত গণ্ডগোলে পড়ব জানলে আমি—'

—'জানলেও কী-ই বা করতেন, মাদ্‌মোয়াসেল্? এ বিদেশ বিভূঁয়ে—আপনি একলাটি—অসহায়—তার ওপর মেয়েমানুষ।'

—'তাই তো দিনকতক হবেই স'য়ে থাকতে। দেখি বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস ক'রে। আমাদের দেশের কত ছেলেমেয়ে আছেন এখানে। কারো না কারো সঙ্গে দেখা হবেই দুদিন পরে।'

—'সেই ভালো।. এখন আমার ষ্টোভটা এনে দেব কি? ঘরটা একটু গরম হ'লে না হয় নিয়ে যাব আবার—'

—'তোমার শীত করবে না?'

—'করলেও আপনার মতন নয়, আমাদের হাড়ে—'

বাইরে মিসেস রীড বাক্‌লির গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল—'আসতে পারি কি?'

দোর খুলে দিয়েই মাদলীন ছুটে চ'লে গেল।

ভদ্রমহিলা ধীর-পদক্ষেপে জ্যোৎস্নার কাছে এসে বললেন—'কেমন, আরাম হয়েছে তা? আর একখানা কম্বল দেব? সত্যি শীত পড়লে গরম জলের বোতল দেব বিছানায়। এখন থেকেই আগুন পোয়ানো আর গরম বোতল পিঠে দিয়ে শোয়ার অভ্যেস করলে সত্যিকার শীতের সময় তোমাকে চারটে বোতল আর ভারে ভারে কয়লা দিয়েও পার পাব নাকি আমি?'

—'তাই বুঝি দিচ্ছেন না? কিন্তু আমার গরম দেশের হাড় যে এই মায়া-ই—'

—'চুপ, বেশি কথা বলে না—এতটুকু মেয়ে বড়দের সঙ্গে সমানে জবাব করে! ন-ব্রেড মেয়েরা যা বলি তা-ই শোনে। ভালো কথা, ওই মাদলীনের সঙ্গে তোমার গলাগলি আমার পছন্দ হয় না। ওরা ছোটলোক, চাকরাণী, যা তা ইংরিজি -কাল্‌চারের জানে কী যে, তুমি ওর সঙ্গে এত রাত্তিরে মুখোমুখি ফিশফাশ া?'

—'কেন?—ওকে তো বেশ ভালোমানুষ—'

—'ভালোমানুষ? ভারি জানো তুমি কি না! ডুবে ডুবে জল খায়। কেন এসেছে এদেশে জানো? ওর ছেলে আছে—ছাদে ছোট্ট পায়রার খোপের মত একটা ঘরে থাকতে দিই—'

—'তাতে কী হয়েছে?'—

—'কী হয়েছে? বাঃ বেশ মেয়ে তুমি—এ-ও ব'লে দিতে হবে নাকি? পালিয়ে এসেছে বেলজিয়ম থেকে। বুঝতে পারছ না?'

—'না।—'

—'হাঁসপাতালে নার্স ছিল। স্বামী নেই'—মুখে শ্রাবণের মেঘ ঘনিয়ে আসে ওঁর—'কোনোকালে ছিল না। বুঝলে তো এবার?'

—'ওঃ—'

—'হ্যাঁ ; তাই ওর সঙ্গে তোমার কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আমি বরদাস্ত করব না।

এতটা মুরুব্বিয়ানায় জ্যোৎস্নার গা-র মধ্যে হিমেও উত্তাপ দেখা দিল, সে ঈষৎ বিরসকণ্ঠে বলল—'কিন্তু, মিসেস বাক্লি, আমার বলবার কথা এই যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যতটা ভদ্রতা আর সুশীল ব্যবহার করা উচিত, ততটা করতেই হবে আমাকে —তা সে যেরকম লোকই হোক।'

মিসেস বাকলির স্বর আরও একটু রুক্ষ শোনাল—'বেশ। কেবল আমার কর্ত্তব্য আমি করলাম—কথাটা তোমাকে ব'লে রাখলাম : আমার ছেলেদের ওর ছায়াও মাড়াতে দিই না।—আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও তোমার এখানে ব'সে ব'সে অনর্গল ব'কে যাচ্ছে, তাই আসতে হ'ল ওপরে।'

—'আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমায় দেখতে এসেছেন।'

—'তার কোনো দরকার আছে কি? তোমায় তো নিচেই শুভরাত্রি জানিয়েছিলাম।'

জ্যোৎস্না চুপ ক'রে রইল। বলবে কী ও এই বটের জটের মত শুক্‌নো মানুষটিকে? হৃদয় ব'লে কোনো বালাই-ই কি ওঁর আছে সত্যি?

প্রথম রাতটা জ্যোৎস্নার নানান্ দুঃস্বপ্নে কাটল। পরের দুদিন শনি আর রবিবার। 'জনি' এই দুটো দিন বাপ-মার কাছে থাকতে আসে। ও-ই ওদের বড় ছেলে, মায়ের মত ছফুট লম্বা, কিন্তু চোখেমুখে সে ধূর্ত্তামি আর কূট বুদ্ধির ছাপ নেই। উল্টো—কেমন যেন নির্ব্বোধ ধরণের চেহারা। খেতে ব'সে যত রাজ্যের আজগুবি গল্প করবে। ডিনারের টেবিলে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়ে মুখ লাল ক'রে ফেলবে—তবু থামবার নাম নেই। জ্যোৎস্না উঠেও যেতে পারে না, আবার ব'সে থাকতেও কী যে দারুণ কষ্ট—! এক একবার জনি ওর দিকে এমন ক'রে তাকায় আর হাসে যে, ইচ্ছে করে কিছু একটা ছুঁড়ে মারে। জনি ওর মদ খেতে আপত্তি করার কথাও শুনেছে বাড়ি এসে, তাই নিয়ে টেবিলে আর ড্রইংরুমে সে কী হাসাহাসি! জ্যোৎস্না যত শীগ্‌গির পারে সেই ঠাণ্ডা শোবার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে গায়ে কম্বল জড়িয়ে ব'সে ব'সে ভাবে—কী করলে এই পোড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? সোজা বাবাকে লিখবে?—না, সব আগে একবার

হ্যালিডেকে সব খুলে বলাই ভালো। হ্যালিডেরা আর যা-ই হোক না কেন—নিষ্করুণ নয়। তাছাড়া এরকম ছেলেও ওদের নেই যে প্রতি সপ্তাহের শেষে বাড়ি এসে মদ খেয়ে খেয়ে তিতিবিরক্ত ক'রে মারে সবাইকে। সব চেয়ে বিরক্তির কারণ —বাক্‌লি-দম্পতি ছেলের অভব্য দুরন্তপনায় একটি কথাও বলে না—কোথায় যায় তখন ওদের আভিজাত্য, কোথায় বা এটিকেট? আজ দুপুরে ও স্বচক্ষে দেখেছে : জনি কর্ম্মনিরতা মাদলীনের পিছন পিছন ঘোরাফেরা ক'রে কি সব বিশ্রী 'স্মার্ট' রসিকতা করছে—মাদলীন কিছুতেই ওর হাত এড়াতে না পেরে শেষটায় বিকেলে এক ফাঁকে ওর ঘরে আশ্রয় নিলে, বললে —'দেখেছেন তো মাদ্‌মোয়াসেল্‌? অথচ এর জন্যে সব গালমন্দ শুনতে হয় আমাকেই, মিষ্টার জনি চ'লে যাওয়ার পরে। কম বিরক্ত করে আমায়?'

—'ও না কোথায় মস্ত চাকরি করে, মাদলীন?'

—'উঃ—ওক গাছের মতন মস্ত!—ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে একটা কেরাণীগিরির জন্যে উমেদারি করছে আজ ক'বছর ধ'রে!'

—'পায়নি?'—

—'ক্ষেপেছেন? ওকে দেবে কে চাকরি? উন্মাদ তো আর নয় তারা। শুনেছি কি-সব ফাই-ফরমাস খাটে মাঝে মাঝে—তাইতেই গোটা দশ বারো শিলিং পায় হপ্তায়। বাকি খরচ সব বুড়োবুড়িকে জোগাতে হয় ঘর থেকে। দেখেননি একটা মোটর-বাইকে ক'রে এসেছে?—মাসের মধ্যে ক'বার যে জরিমানা দিতে হয় বেকায়দায় গাড়ি চালানোর জন্যে, তার ঠিক নেই। সে পয়সাও গচ্চা দিতে হয় ওঁদেরই। ও হ'ল ঠাকরুণের সবার বড় আর সব চেয়ে নেওটো ছেলে—দেখতে মার মত, তাই বুড়োও ওকে কিছু বলতে সাহস পায় না। থাকুন না কদিন, মাদ্‌মোয়াসেল, টের পাবেন সবই এক এক ক'রে। ওদের অভিমান, ঠাট, ভড়ং সব ওপরকার—তলায় পাঁক যে কত—', ব'লে কাছে স'রে এসে এদিক ওদিক চেয়ে ফিশফিশ ক'রে বললে—'উইক-এণ্ডে বাড়ি এলে রাত্তিরে ঘুম হয় না আমার—ভাগ্যিস খোকাটা ছিল, কাঙালের ধন!—'

জ্যোৎস্না বিবর্ণ মুখে বললে—'বলো কি?—এতটা?'

—'সত্যি বলছি, মাদ্‌মোয়াসেল, এই ক্রস ছুঁয়ে—'

—'ব'লে দাও না কেন?'

ম্লান হাসে ও :

—'গরিবের কথা বলুন কানে তুলবে কে—যে বলব? আর, জনির বিরুদ্ধে বলব ওর মাকে! ..তাও বলেছিলাম দু-একবার। ঠাকরুণ কি উত্তর দিলেন জানেন?' মাদলীনের চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠল ;—'বললেন, তোমার বেবিটার বাপের ঠিকানা—'

—'ছি ছি, থাক, আর বোলো না।'

ওরা দুজনে যেন পরস্পরের কত কাছে এসে গেছে হঠাৎ!...মাদলীনের চোখ চিক-চিক ক'রে ওঠে। জ্যোৎস্না ওর একটা হাতের 'পরে খানিক হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল : 'কাঁদে না—ছী।'

মাদলীন চোখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রেণু বলে—'তবু তুমি থাকো কেন এখানে?'

—'থাকতে হবে না আর বেশিদিন। কিন্তু বিদেশী মেয়ে, সহজে কাজ জোটে কি বিভূঁয়ে? সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে কোলের ঐ একরত্তিটাকে নিয়ে—একলা হ'লে ভাবত কে? একটা পেট চ'লে যেতই, কিন্তু কপালদোষে যখন একবার'—মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল বেচারির—থেমে গেল।

জ্যোৎস্না চোখ নামিয়ে নিলে। হৃদয়টা ওর এত ভিজে ওঠে!...

মাদলীন বলল—'একজনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিকঠাক। খোকার ভারও সে নিতে রাজি। সে একটা চাকরি পেলেই চ'লে যাবো এখান থেকে—হাড় জুড়োবে।' জ্যোৎস্না খুসি হ'য়ে বললে—'সে-ই বেশ হবে। নিজের ঘরকন্নায় নিজের মর্য্যাদায় থাকবে, যতই গরিব হও না কেন। কিন্তু থাক্ এখন এসব আলোচনা মাদলীন, মিসেস বাক্‌লির কানে গেলে তোমায় বকবেন—'

—'ঠাকরুণের ভয় পাছে আমি ভিতরের অনেক কথা দিই ফাঁশ ক'রে। জানি কিনা একটু-আধটু! ওরা বুঝি শুধু শুধু রেখেছে আপনাকে? কেবল নানাদিক দিয়ে আপনার কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করবার ফন্দি। ছিল এখানে আপনার আগে এক রাশিয়ান ছাত্র—'

—'সত্যি? তবে না ওঁরা এর আগে কখনো পেয়িং গেষ্ট্ রাখেননি?'

—'রাখেননি আবার! তার আগে ছিল এক আর্মেনিয়ান ইহুদি—কারবারী, ইংরিজি জানে—তাকে ঠকানো সহজ নয়। সে শুধু পঁয়ত্রিশ শিলিং দিয়ে থাকত, আর তা-ও ঐ দোতলার ভালো ঘরটায়—যেখানে গ্যাসরিং আছে—সেটাই আসলে পেয়িং গেষ্টদের জন্যে। আপনার অভিভাবককে সে রুমটার কথাই লিখেছিল ওরা, যদিও দেবার সময়ে দিয়েছে ওপরের বাজে ঘরটা, কিন্তু কেন জানেন? যত ভাড়ায় রাজি হ'য়ে এসেছেন, তার চাইতে আর একটু বেশি আদায়ের জন্যে। রাশিয়ান ছাত্রটি দিত আরও কম—বত্রিশ শিলিং। তবু আপনার কাছে সেই একই ঘরের জন্যে এই যে দুগুণ চাওয়া—এ-ও একটা চাল : জানে কি না দুগুণ চাইলে অন্তত দেড়গুণ দেবেই বেচারি মেয়ে আপনি—না জানেন দর-কষাকষি, না জানেন বড়ঘরের ফিকিরফন্দি। কিন্তু—ইয়ে—এসব কাজ করবে কী ক'রে জানেন? খুব সাবধানে—ভদ্রভাবে।'

—'তুমিই বা এত কথা জানলে কী করে?'

—'খাবার টেবিলে সব বলাবলি করত মাদ্‌মোয়াসেল্। বড়লোকেরা ভাবে—জানেন তো—যে ছোটলোকেরা ভড়ং দেখলেই যায় ঘাবড়ে! জানে না তো—কিন্তু সে যাক। দেখবেন সব নিজেই—' মাদলীন বাঁকা হাসে—'তাছাড়া—এ-ও বুঝলেন না?—কালা-বিদ্বেষ যে সাদার মজ্জাগত—সেই আশায় ওরা ভেবেছে আমিও লুটপাটে ওদের সঙ্গে যোগ দেব। আপনার কাপড় ধুয়ে—বেশি ক'রে আদায়ের ইসারা—'

—'হুঁ, শুনেছি'—জ্যোৎস্নার আর ভালো লাগছিল না এসব শুনতে। ভিতরে ভিতরে ওর মন বড় কান্নাটাই কাঁদছিল। জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনো এত প্যাঁচ, এত কুটিলতার সঙ্গে পরিচয় হয়নি ওর। তাই সামান্য সাধারণ লোভের দৃষ্টান্তেও সংসারটা যেন কালিয়ে ওঠে!—মাদলীনের হঠাৎ ডাক পড়ল। সে চ'লে গেল। ও ভাবে আর ভাবে। ...আজ

রবিবার, কালকেই সাউথ কেনসিংটনে যাবে হ্যালিডেদের কাছে। এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে ব'সে পা দুটো জ'মে যাবার উপক্রম হয়েছে যে। উঠে বিছানায় ঢুকবে, না কি করবে —ভাবছে, এমন সময় মাদলীন বাইরে থেকে ডেকে বললে—'মাদাম আপনাকে নিচে আগুনের ধারে গিয়ে বসতে বললেন। ড্রইংরূমে দিব্যি আগুন জ্বলছে, যান না মাদ্‌মোয়াসেল্—অত মন খারাপ করে না, আপনাদের ভাবনা কি, পয়সা থাকলে এদেশে আর সত্যিকার ভয় পাবার কিছু নেই।'

ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা সহজ প্রবোধ ওঠে ফুটে...জ্যোৎস্নার এত ভালো লাগে...ভরসাও পায়। বাস্তবিকই তো ও মিছামিছি কেন এতক্ষণ এত দুর্ভাবনা ক'রে মরছে! হ্যালিডে ওকে বিশ্বাস না করলেও, এ-বাড়ি বদলাতে না দিলেও, মাদলীনের মতন অনাথা তো ও নয়—নিঃসম্বলও নয়।—শুধু একটা টেলিগ্রাম করবার অপেক্ষা। নাঃ, এরকম 'পল্লবিনী লতেব' হ'লে চলবে না, একটু শক্ত হ'তেই হবে—মনটা কঠিন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। চিরদিন মাধবীলতার মত সহকার খুঁজে বেড়ায়, পেলে বাঁচে, না পেলে ধুলোয়-কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে জীবনান্ত করে, —ভারতীয় নারীর এই 'অবলা' অপবাদের ইতি হওয়া দরকার। ভাবতে হবে নিজেকে এখন ছাত্রী —স্কুল অব্ লাইফ-এর, এবং প্রতি কঠোর পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে হ'তে হবে উত্তীর্ণ।

মুখহাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জ্যোৎস্না চলল নিচে। ড্রইংরুমের সাম্‌নেই জনির সঙ্গে মুখোমুখি।

—'কি মিস্—ইয়ে—জয়, আমরা যে আপনার দেখাই পাই না! মাঝে মাঝে আসবেন একটু নিচে-পানে কিম্বা এপাশ-ওপাশ—বেডরুমে গিয়ে তো আর হামেশা উঁকি মারতে পারি না—এখনই কি ততটা লিবার্টি—'

—'ধন্যবাদ মিষ্টার জনি, একবার কেন, হাজারবার দেখবেন নিচে—যদি ততদিন আপনাদের বাড়ি থাকি। এখন একটু স'রে দাঁড়ান দেখি, আমি যাই ভেতরে—'

—'আহা—হা—অত standoffish কেন গো।' ব'লে একটু কাছে ঘেঁষতে যায়। মদের গন্ধ!—জ্যোৎস্না একটু স'রে গিয়ে তাকায় ওর পানে কটমট করে। জনি সটাং হেসে বললে—'আহা—হা—এত বেরসিক কেন সুইট—', হাত ধরে আর কি। ও পাশ কাটিয়ে জোরে দরজায় টোকা দিলে। তারপরে জনির দিকে ফিরে চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বললে—'সাবধান—এগিয়ো না এক পা-ও আর। ভেবেছ বুঝি এটা তোমাদের বাড়ি ব'লে যা-তা ব'লে পার পাবে?—আমরা পথের মেয়ে নই যে তোমার ইতরতা ভয়ে ভয়ে সহ্য করব—'

ড্রয়িংরুমের দরজাটা খুলে মিসেস বাকলি বললেন—'কী—কী?—এত গোলমাল কিসের? দরজা তো খোলাই ছিল—'

—'মামি, এটা একেবারে আগাগোড়া জিপ্‌সী মেয়ে—vixen একটা—ছুঁতে না ছুঁতে তড়বড়্ ক'রে ওঠে। জিজ্ঞেস করলাম মেলামেশা করতে এত নারাজ কেন—একটু ইনোসেণ্ট—অম্‌নি—বাই জোভ্—শুধু শুধু গেল ক্ষেপে—'

মিসেস বাক্‌লির মুখের ভাবখানা পলকে বদ্‌লে গেল—'এসো জয়, এসো—চল

একটু গল্প করিগে ডিনারের আগে। আজ আমাদের কোনো কাজকর্ম্ম নেই, রবিবার —ঢের অবসর।'

ঘরে ঢুকে একটু দম নিয়ে যথাসাধ্য সহজ হ'তে চেয়ে জ্যোৎস্না বললে—'রবিবার আপনারা চুপচাপ থাকেন না?—গির্জ্জায়—'

—'ওঃ—সে সব কি জানো—ক্যাথলিকরাই একটু বেশি বেশি ভড়ং করে। আমরা সাবেকি প্রটেষ্টান্ট্, কখনো ধর্ম্ম নিয়ে বাইরে বাড়াবাড়ি করি না, ধর্ম্ম হচ্ছে ভেতরকার জিনিষ—যেখানে-সেখানে জাহির করতে নেই। Exhibitionism is not aristocratic. জাহিরিপনা করে—যারা ভাল্‌গার।'

'হুঁ।'

—'আমার স্বামী', মিষ্টার বাক্‌লিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে—'ভয়ানক উঁচু বংশের ছেলে, রাজার নীল রক্ত এঁর শরীরে—'

—'বলেন কি?'

—'অ-বি-ক-ল। অষ্টম হেনরীর কুলতিলক ইনি! আমিও এক সাক্ষাৎ কর্ণেলের মেয়ে। আমার বাপকে এক কমিশন নিয়ে ভারতবর্ষে যেতে হয়—'

—'ও—'

—'শুধু এদেশের নিয়মে বড় ভাইই সমস্ত ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ব'লে —অন্য সব ছেলেদের খেটে খেতে হয়—'

জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে বললে—'পড়েছি বটে ইতিহাসে—'

মিসেস বাক্‌লি সগর্ব্বে বললে—'পড়বে বই কি। তা শোনো—আমার স্বামী আজ পর্য্যন্ত ডিনারের ড্রেস না পরলে খেতেই পারেন না, হপ্তায় একটা অন্তত টার্কিস বাথ ওঁর চাইই—উপ্‌রি—বাড়িতে নিত্যি স্নান তো আছেই। এককালে বিস্তর টাকা ছিল—এখনো কম নয়—বাপের দিক থেকে দেওয়া আমার বিয়ের যৌতুক সব জমা আছে—আমরা তিনবোন বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে পেন্সন পেতাম—'

—'সে কি! আপনারাও চাকরি—'

—'পাগলের মত কথা বলে না। আমরা চাকরি করতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমাদের বাপ বড় চাক্‌রে, তাই আমাদের খোরপোষ দিত গবর্ণমেন্ট—'

—'কই, সেরকম তো কোনোদিন শুনিনি!'

—'তুমি কী-ই বা শুনেছ, কী-ই বা জানো—বলো?'—ব'লে উঠলেন ঠাকরুণ ঈষৎ অতিষ্ঠ সুরে। 'তাই শোনো যা বলি : তখনকার দিনে বাপ পেন্সন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও পেত। "আই সি এস"এর বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর পেন্সন আজীবন ভোগ করতে শুনেছ, না, তা-ও শোনোনি?'

জ্যোৎস্নাব একটু দুষ্টুমি চাপল, এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলল : 'ও—তাই বুঝি ভারত আর ভারতবাসীকে পেয়ার করেন এত?'

—'পেয়ার?' শ্রীমতী বোধহয়, কথাটা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারলেন না।

—'মানে, আমাদের দেশে প্রবাদ আছে একটা—যার নাকি নুন খায়—'

—'তুমি বুঝতে পারছ না কিছুই। ভারতবর্ষে যাই-ই-নি কোনোদিন, নুন খাব কি?

টাকা দিত ওরা সেধে—ডিউটি ...'

এবার ও হাসিটা চেপে গেল, প্রশ্নটাও—যদিও জিভের ডগায় এসেছিল—'দিত টাকা কোন্ খাজাঞ্চি—আর কার রাজকোষ থেকে?' কিন্তু ঠেশ দিয়ে হবে কী—যখন অভিজাত-ঘরণীর এত ধূর্ত্ত মাথাটাও সূক্ষ্ম খোঁটা বুঝবার মত তত সূক্ষ্ম নয়। শুধু বললে—'এতই টাকা যদি আপনাদের, মিছে কষ্ট ক'রে পেয়িং গেষ্ট রাখেন কেন?'

—'কী যে সব প্রশ্ন করো—না আছে মাথা, না মুণ্ডু—যেন টাকার জন্যেই অতিথি রাখি আমরা। খাঁ খাঁ করে এতবড় বাড়ি, ছেলেরা সব বছরের বেশির ভাগ বাইরে বাইরে কাটায়। লোকজন থাকলে আমাদের কালচারের ছিটেফোঁটাও তো পায় তবু—'

—'খুব সাধু ইচ্ছে বৈ কি মিসেস বাক্‌লি। কেবল তাহ'লে ভাড়া সম্বন্ধে কোনো কড়াকড়ি নেই বলুন? লাভের দিকে চোখ তো ওই ল্যাণ্ডলেডিদের। আপনাদের ঠিক খরচটুকু দিলেই চ'লে যায়, এই না?'

—'তার বেশি আমরা নেবই বা কেন? নেহাৎ নিজের পকেট থেকে তো আর খাওয়াতে পারি না—সবাই নিজেরটা দেখে।'

—'তাহ'লে ওপরতলা আর নিচের তলায় আড়াই গিনি তফাৎ হ'ল কেন, মিসেস বাক্‌লি? আড়াই গিনি দর দস্তুরে এসেছি—এখন পাঁচগিনি চাইছেন সেই একই রুমের জন্যে!'

—'তুমি যে এ-হেন অভিজাত পরিবারে স্থান পেয়েছ, তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমানে মিশবার, একটেবিলে ব'সে খাবার, আলাপ করবার এমন কি সমান সমান হাসি মস্করা করবার পর্য্যন্ত সুযোগ পেয়েছ, তার কি একটা মূল্য নেই মনে করেছ?'

—'ওঃ—তাহ'লে বাড়তি দাবিটা আভিজাত্যের ট্যাক্স, এই-ই কি?'

মিসেস বাক্‌লির মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল—'একশোবার। যাও না দেখি গ্রামে, —সবই খুব সস্তা পাবে—।'

—'এমনি কি, সুইটহার্টও'—জনি চোখ টিপে বললে। এতক্ষণ সে কি একটা পিকটোরিয়ালের পাতা উলটোচ্ছিল।

মিসেস বাক্‌লি এ-কথায় একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে ব'লে চললেন—'তা ছাড়া পাবে কোথায় এমন ড্রইংরুম, এমন কাঠের আগুন, ডিনার-টেব্‌লে কচি মুর্গি আর গরুর বাচ্চা, যখন ঘন্টা বাজাবে—চাকরাণী—বিশুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ, রিফাইনমেন্ট—অক্সফোর্ডের ষ্টুডেন্ট ছেলে—রয়েল ম্যারিনের লেফটেনান্ট—'

—'থাক', জ্যোৎস্নার মুখ লাল টকটক্ করছে। ঐ চাষা মাতাল জনিটার অভদ্র ব্যঙ্গে ওর মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেছে এক ঝলকে। মিসেস বাক্‌লি বাধা পেয়ে চম্‌কে গেলেন।

—'বর খুঁজতে আসিনি এদেশে, ভারি দুঃখিত। তা নইলে পাঁচ গিনি কেন, দশগিনিও দেওয়া যেত। কিন্তু ঢের হয়েছে—আর না। আমি চললুম আমার ঘরে, দয়া ক'রে মাদলীনকে দিয়ে আজকের খাবারটা ওপরেই পাঠাবেন।'

—'সে কি!—টেবিলে খাবে না?'

—'মিসেস বাকলি, আমার দেহে রাজ-রক্তের অভাব, নেহাত প্লিবিয়ান মেয়ে—আপনাদের মুর্গি-পবিত্র রয়্যাল টেবল্ আর কলুষিত করব না—'

মিসেস বাকলি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—'তুমি তাহ'লে আমার বাড়িতে থাকতে চাও না?—এই মৎলব, কেমন?'

—'অ-বি-ক-ল।'

মিসেস বাকলির মুখচোখ ঝলকে উঠল খানিক আগের তাঁর কথার এই প্রতিধ্বনিতে। বললেন—'আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না তাহ'লে। তোমার অভিভাবকের কাছে সমস্ত রিপোর্ট ক'রে মজাটা টের পাওয়াব—'

—'অভিভাবকের উপরও অভিভাবক আছে। আচ্ছা, গুডনাইট—সবাই!'

—'অবাধ্য উদ্ধত মেয়ে! তুমি ইচ্ছে করলেই যেতে পারো না হ্যালিডের অনুমতি ছাড়া—তা জানো?' ততক্ষণ ও দোবের হাতল ঘুরিয়ে—

জনি ঝট্ ক'রে এসে হাতল চেপে ধ'রে বললে—'এত চটো কেন মাই স্প্যারো? ফি শনিবারে আমি আসি, বাইকের পাশে টুকটুকে ক্রেডলসিটটা দেখেছ? মাইলকে-মাইল স্প্যারোকেও হারিয়ে হাওয়ার বেগে উড়ে যাব আমরা। একটু ট্রায়াল দিয়েই দেখ না গো—'

ও পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে দ্রুত উপরে ছুটল।

তারপর, কোনোমতে উপরে গিয়ে—ভাঙল বাঁধ—নামল বান—কান্না আর কান্না!...এ-তকরার কি সয় ওর স্বভাবে?

বাইরে মিসেস বাকলির গলা শোনা গেল—'আমরা সিনেমায় যাচ্ছি, আসবে তুমি আমাদের সঙ্গে?'

—'না।'

—'কেন? এসো না, বেশ ভালো ছবি আছে।'

—'ধন্যবাদ, আমি এখন বেরুব না।'

—'আচ্ছা, থাকো তাহ'লে, আমি জনিকে নিয়েই চললাম।'

সিঁড়িতে মিসেস বাক্‌লির পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

চোখের জল চোখেই শুকিয়ে গেছে...কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়েছে!...কি একটা শব্দে হঠাৎ চোখ খুলে দেখে ঘরের ভিতর ওর বিছানার একেবারে কাছে—কে যেন দাঁড়িয়ে। ধড়মড় ক'রে উঠে ত্রস্তকণ্ঠে বললে—'কে? কে ওখানে?'

—'আমি—আমি, ভয় নেই গো!'

—'মিষ্টার বাক্‌লি?'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অমন করো কেন?' খাটটার কিনারায় ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে সান্ত্বনার সুরে—'বাস্তবিক আমি ভারি দুঃখিত জয়, যে মিসেস বাক্‌লি তোমায় যখন-তখন যা-তা ব'লে এত কষ্ট দেয় মনে। কিন্তু কিছু বলতে তো পারি না ওদের সাম্‌নে!'

—'এই কথা বলবার জন্য এত রাত্তিরে আমার শোবার ঘরে—'

বুড়ো ওর হাতখানা প্রায় ধ'রে ফেলে আর কি—'শুধু সেজন্যে নয়, প্রথম থেকে তোমাকে আমার সত্যি কী যে ভালো—'

বিস্ময়ে ভয়ে ওর প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। অতর্কিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —'মাগো!' ধড়মড় ক'রে উঠে বসে।

বাক্‌লি হঠাৎ ওর হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল, বললে—'যাবে ডিয়ার, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে? এই অঞ্চলেই ভালো "শো" আছে, কফি হাউস্‌ও—'

বৃদ্ধের দেহে সাতটা জোয়ানের বল এখনো। মুখেও ব্র্যাণ্ডির তীব্র গন্ধ...একলা, অসহায়!—জ্যোৎস্নার সমস্ত দেহ-মন পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত স্তম্ভিত, প্রায় নিঃসম্বিৎ!...

হঠাৎ ঘরের দরজা গেল খুলে। মাদলীন এক সেকেণ্ড নিঃশব্দে ব্যাপারটা চেয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—'যা ভেবেছি তা-ই!'—ছুটে এসে হতবুদ্ধি জ্যোৎস্নার অন্য হাতখানা ধ'রে টেনে তুলে বললে—'ভয় কি মাদ্‌মোয়াসেল্? কিচ্ছু ভয় নেই, একটু শক্ত হোন দেখি এখন। কী করবে ও? এ স্বাধীন দেশ,—আশেপাশে মানুষও আছে।'

এতক্ষণে বাক্‌লির মুখে কথা ফুটল—'কে এমন ক'রে আসতে অধিকার দিয়েছে তোমায় এ-ঘরে? মিস চাটার্জ্জির শরীর ভালো নেই, তাই আমি—'

—'শ্—শ্ বেশি গোলমাল করলে চেঁচিয়ে সাতটা পাড়ার লোক জড়ো করব।' জ্যোৎস্নার দিকে ফিরে—'ওঁকে এ-ঘরে অমন পা-টিপে-টিপে ঢুকতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

—'খবরদার মাদলীন!'

মাদলীনের চোখে আগুন জ্ব'লে উঠল—বৃদ্ধ দু'পা হ'টে গেলেন। ও জ্যোৎস্নাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলো। দুহাতে ওর একখানা হাত চেপে ধ'রে স্খলিত কণ্ঠে সে বললে —'এখনই একখানা ট্যাক্সি—'

—'ডেকে দিচ্ছি মাদ্‌মোয়াসেল, জিনিষপত্তরও গুছিয়ে রাখব। কালই লোক এসে নিয়ে যায় যেন—কোনো ভয় নেই।'

পাঁচমিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এলো। উঠে ব'সে জ্যোৎস্না মুখ বাড়িয়ে ছলছল চোখে বললে —'বোনের বাড়া হ'লে তুমি আমার মাদলীন, এই বিদেশে। তুমি না থাকলে আজ—, কিন্তু এরপর তোমারই কি আর এ বাড়িতে থাকা চলবে?'

হাসিমুখে মনের চিন্তা ঢেকে মাদলীন উত্তর করলে—'কালই বিদায় ক'রে দেবে, কিন্তু তাতে কি—যে কোনোরকমে—'

—'বেশি কথার সময় নেই এখন। কিন্তু কাল নিশ্চয় এসো একবার,—এই নাও বাড়ির নম্বর, সাউথ কেনসিংটন। আমার অভিভাবকের বাড়ি, তাঁরা সত্যি ভদ্রলোক। তোমার যতদিন না ভালো কাজ জোটে একটা—'

—'ধন্যবাদ, মাদ্‌মোয়াসেল্। মেরীর দিব্যি, আসবই আমি।'

—'জানো তো আমার টাকা আছে যথেষ্ট, বেকার অবস্থায় কোনো কষ্ট হ'তে দেব না তোমার—আর—আমাকে পর মনে কোরো না মাদলীন, কেমন?'

মাদলীনের চোখে জল উপছে পড়ল—'না, করব না মাদ্‌মোয়াসেল্—দেখা করব কালই। গুডবাই মাদ্‌মোয়াসেল্!'

—'গুডনাইট মাদলীন! মনে থাকে যেন।'

হ্যালিডে-গৃহিণী মিটার দেখে চমকে উঠলেন, 'কী সর্ব্বনাশ, তুমি তো ফতুর করবে দেখছি তোমার বাপকে—এমনিভাবে ট্যাক্সিতে ঘোড়দৌড় খেললে!'...

জ্যোৎস্না বললে—'এর দশগুণ মিটারে উঠলেও দিতে হ'ত আজ—'

—'ওমা—সে কি গো? কী ব্যাপার?'

সব কাহিনী শোনা হ'ল শেষ।—অতঃপর কর্ত্তা তাকালেন গৃহিণীর পানে, গৃহিণী তাকালেন কর্ত্তার পানে।

কতক্ষণ পরে—'হ্যারি!'

—'উঁ!'

—'রাজার নীল-রক্ত—নীল ব'লে নীল!—ঘোরতর নীল—মস্ত ঘরের আভিজাত্য! কথা নেই যে মুখে? কি?' মুখে তাঁর বিজয় হাস্য!—জ্যোৎস্নার মনে পড়ে যায়—প্রথম দিন ওঁদের এখানে লাঞ্চ খেয়ে বিদায় নেবার একটুখানি আগে হঠাৎ মিসেস হ্যালিডের হয়েছিল সন্দেহ—ছেলেমানুষ মেয়েটিকে না দেখেশুনে কোথায় কার বাড়ি পাঠানো হচ্ছে কে জানে! তা-ই নিয়ে কথা কাটাকাটি—শ্লেষ—অবশেষে সেই কী বলে যেন? সেই —দাম্পত্য 'বহ্বারম্ভে?'—

হ্যালিডে অধোমুখে নতুন কেনা চশমাখানি মুছতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। স্ত্রীর সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কান দিতে গেলে পুরুষের যদি চলত! কেবল, আজ কিসে যেন বড্ড নাড়া দিয়ে গেছে তাঁর আভিজাত্যের আজন্ম-লালিত ধারণায়,—উপলক্ষ—একটি তরুণী বিদেশিনী!

রাশিয়ান ক্যাট

আমার সাত-বছরের ভাই-পো টুনুর বেড়াল পুষবার সখ হয়েছে। আমি বাড়িতে বেড়াল আনতে দিই না, তাই ও পাশের বাড়ির মাসিমার আঁচল ধ'রে টেনে আমার কাছে নিয়ে এসেছে ওকালতি করতে ওর হ'য়ে। আমি পড়ছিলাম, মুখ তুলে বললাম—'কি টুনু, কি চাই?'

—'মিনি, কাকাবাবু!'

চমকে বললাম—'মিনি?'

মাসিমা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। তাঁদেরই হ্যাম্পসটেডের বাড়ির একটা বেড়ালছানা—আব্দার ধরেছে ওর চাই-ই। এরই মধ্যে নামটামও দেওয়া হ'য়ে গেছে। অন্যমনস্কভাবে বললাম—'আচ্ছা, দেখি।'

হাতের বইখানা মুড়ে রেখে কত কথাই ভাবতে লাগলাম। মনে হ'ল—যখন '—' ইউনিভার্সিটির জমকালো ডাক্তারি ডিগ্রি নেবার জন্যে প্রথম বিলেত যাই, সঙ্গে ছিল

অপর্ণা। ও তখন বেড়াল মোটে দেখতে পারত না। ছোট থেকে নাকি এই প্রাণীটার ওপর ওর দারুণ বিতৃষ্ণা। তার কারণ আমাকে যা বলেছিল তা সংক্ষেপে এই :

ছেলেবেলায় ও ছিল বড় কাঁদুনে, একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে থামায় কার সাধ্য? কোনো খাবারের লোভে ভুলবে না, ধমকানিতে দমবে না। ভারি একরোখা জেদী মেয়ে। একদিন তেমনি কেঁদে চলেছে—ওর এই একঘেয়ে এঁ—এঁ—সুরের কান্না মা, খুড়ি, জ্যেঠাই সকলের কানে স'য়ে গেছে। যতক্ষণ ইচ্ছে প্রাণভ'রে কাঁদবার সুযোগ দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে রেখে যে যার কাজ ক'রে যায়। কে একটা মেয়েকে নিয়ে দিনরাত মল্লের মত কুস্তি লড়বে? মস্ত একান্নবর্ত্তী সংসার, ছেলে-মেয়ে আরো আছে—তাদেরও তো দেখতে হয়। কেবল, বড় বেশি অসহ্য হ'লে এক একদিন মা কাজ থেকে উঠে এসে পিঠে ক'ষে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে যান ; কিন্তু ঠাকুরমার জন্যে—দু-এক ঘা দিয়ে যে বিমল সুখ, তা-ও পাবার জো নেই। মেয়ের দ্বিগুণ জোরে চেঁচামেচি শুনলেই বকতে সুরু করেন —'মেয়ে কি বানের জলে ভেসে এসেছে লা? বড যে মনের মতন হাতের জোর পরখ করছিস পিঠের ওপর? ঘর-সংসার আমরাও করেছি, ছেলেপুলেও যে মানুষ করিনি তা নয়। তাই ব'লে যেখানকার যত ঝাল কই—কচি পিঠের উপর তো ঝাড়িনি!'—মা রাগে মুখ কালো ক'রে গোঁজ হ'য়ে থাকেন, কিন্তু শাসন করবারও আর কোনো উপায় খুঁজে পান না। যাহোক, কি বলছিলাম—হ্যাঁ, একদিন ওমনি কান্নার সময় রান্নাঘরের পেছনে আস্তাকুঁড়ের পাশে দুটো বেড়াল সংলাপ করতে করতে ভয়ানক জোরে 'ফ্যাশ' করে ওঠে। যেই সে ডাক শোনা, অমনি ঠাকুরমার আদরিণী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ খুকীর অত যে কান্না—সব মুহূর্ত্তে ঠাণ্ডা। মায়ের আঁচলখানি চেপে ধ'রে কতক্ষণ যে ভয়ে কেঁপেছিল, এখন সে-কথা বলতে গেলে অপর্ণা হেসে গড়িয়ে পড়ে।—তখন থেকে কিন্তু হুলো ডেকে ওর কান্না থামানো বাড়ির সকলের অভ্যাস হ'য়ে গেল। বেচারি একটু জেদের সুর ধরতে না ধরতে চারদিক থেকে সবাই—'ডাকব তবে হুলোকে?—অনিল, ডাক ত ওটাকে—ম্যাও ম্যা—ওঁ—ওঁ—', অপর্ণা তখনি চুপ।

ছ-সাত বছরের মেয়ে হ'য়েও ও খাঁটি হুলোর ডাক আর নকল হুলোর ডাকে তফাৎ বুঝতে পারত না। মাষ্টারের কাছে পড়া সারা ক'রে বাইরের ঘর থেকে অন্দরে আসবার পথে সন্ধ্যায় ছোট ভাইটিও 'হুম—ম্যাও' করলে অপর্ণা রুদ্ধশ্বাসে ছুটে রান্নাঘরে কর্ম্মনিরতা মায়ের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যা বকুনি খেত— ! বড় হ'লে সমবয়সী মেয়েদের কাছে এর জন্যে কত হাসাহাসি টিটকিরি, কিন্তু বেড়ালের ভয় ওর আর ঘোচেই না। জ্বলজ্বলে চোখদুটোকে অন্ধকারে ওর নাকি ভূতের চোখ মনে হয় ; আমাকে বারবার বলে—'তুমি জানো না—বেড়ালের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ভূত-পেত্নি থাকে—নইলে আমরা কেউ দেখতে পাই না, আর ওরা অমন পষ্ট দেখে ঘুরঘুট্টে আঁধারে?'

শুনে আমার হাসি পায়, কিন্তু এসব বেশি আমল দিলে তো চলে না, অথচ সে—ই কবেকার ছেলেবেলার ভয় আর সংস্কার ওর মনে এমন বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে, সব জেনে-শুনেও বেড়ালকে ভূতের সামিল ভেবে এড়িয়ে চলে! মুখে ধমক দিয়ে বললাম—'কী ছেলেমানুষি করছ—লোকে শুনলে বলবে কি? বেড়াল কেন দেখতে পায় আর তুমি পাও না, সে কি জানো না?'

—'আহা, তা কি আর জানি না? কিন্তু ভাবো দেখি, রাত্তিরে উঠেছ, কালো কালির মতন অন্ধকারে তুমি কাউকে দেখছ না অথচ আলোর দেয়ালি জ্বলছে ওর চোখে, ও দেখছে তোমার স—বটা—খুব ভালো ক'রেই দেখছে—আমার ভাবতেও কেমন লাগে, কি আন্‌ক্যানি!'

—'যাও, যাও—আন্‌ক্যানি না ছা—ই। যত সব অনাসৃষ্টি কথা! আমি কিন্তু বেড়াল একটা আনবই তা ব'লে রাখলুম—ইঁদুরের উৎপাতে রাত্তিরে কেবলই ঘুম ভেঙে যায়, কাবার্ডে একটা খাবার জিনিষ রাখা দায়—'

—'সেটা সারিয়ে নিলেই পারো? তাহ'লে তো আর ঢুকবে না—'

—'ঢুকবে না, কিন্তু ইঁদুর তো থেকে যাবে? তাকে নির্ব্বংশ করে কে?'

—'কেন, ফাঁদ বসালেই পারো—'

—'হ্যাঁ, সারাদিন খেটে খুটে এসে রোজ আমি ফাঁদ পাততে বসি,—তোমার যেমন কথা! ওসব চলবে না—বেড়াল একটা রাখতেই হবে ঘরে! জেসি বলছিল পাশের মুদির দোকানে তিন-চারটে বাচ্চা হয়েছে—চাইলেই আমাদের একটা দেবে। আমি কালই মিষ্টার উইলিয়ামসনকে ব'লে রাখব—'

অপর্ণা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে—'ইঁদুর-টিঁদুর সব তোমার অছিলা—আসল কথা—তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে চাও মারতে। এখানে নোংরা ক'রে রাখবে, ওখানটায় গন্ধ করবে, রাত্তিরে একা পথ চলতে পারব না ঘরের মধ্যেও, বেড়াল একটা সঙ্গে সঙ্গে পায়-পায় ঘুরবে—যখন-তখন গলায়—পার্-র্-র্ পার্-র্।'

আমি ওর হাত-দুখানি ধ'রে আদর ক'রে বললাম—'আচ্ছা অনু, এই মিথ্যে ভয় ভাঙাবার জন্যেও তো একটা বেড়াল পুষে দেখা উচিত তোমার—'

—'বরং একটা কুকুর আনো তুমি—'

—'বাস্, দরকার বেড়ালের—আনতে হবে কুকুর!'

—'বেড়াল যা নেমকহারাম—'

—'নেমকহারাম কিসে?'

অপর্ণা রাগ ক'রে বললে—'নয়? বলো কি তুমি? বাড়িতে তো বেড়াল কম ছিল না!—এই একরাশ এঁটোকাটা সামনে ধ'রে দিয়ে, সব পাট তুলে মা একটু শুতে গেছে, কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করবার জো কি? কোনোদিন দুধের ডেক্‌চি, কোনোদিন-বা মাছের কড়ার ঢাক্‌নি উল্টিয়ে মুখ ডুবিয়ে—যার খায় তারই লোকসান। আবার একটু পরে দিব্যি এসে কোল ঘেঁষে কাপড়ে মুখ গুঁজে শোয়—যেন কিছুই হয়নি। নেমকহারাম না তো কি?—কিন্তু দেখেছ কখনো কুকুরকে ও-রকম করতে? যাকে ভালোবাসে, সে মারা গেলে দুঃখে প্রাণটাই দিয়ে দেয়—'

আমি হাসতে লাগলাম।—'তোমার ভালোবাসার আদর্শটা বড্ড উঁচু, অনু—সাধারণ লোকে নাগাল পাবে না। যে বেচারি তোমায়—'

—'হয়েছে, থামো। আবার ওই নিয়ে সুরু কোরো না এখন। কিন্তু বেড়াল তুমি কিছুতেই আনতে পারবে না, তা ব'লে রাখছি। তোমার কি, তুমি তো সারাদিনই বাইরে বাইরে ঘুরবে। একলা বাড়িতে একটা অদ্ভুত জানোয়ারের হাঙ্গাম পোয়াতে হবে তো আমাকেই।'

অগত্যা বেড়াল আনবার প্রস্তাবের এখানেই ইতি করতে হয়। ওই বিদেশে কুকুর-বেড়াল পুষে ঘর-সংসার ফেঁদে বসাই যে আমার মতলব ছিল, তা নয়। বাস্তবিক, ফ্ল্যাটে ইঁদুরের উৎপাতের জন্যেই আমাকে বাধ্য হ'য়ে ও-কথা তুলতে হয়। তারপর অপর্ণার এই অনর্থক বেড়াল-বিদ্বেষ দেখে আমার কেমন একটা জেদ এসে গিয়েছিল যে, এটা ভাঙতেই হবে। কিন্তু চোখে জল দেখে, ওব দুর্বলতা ঘোচাবার মত উৎসাহ আমি নিজের মধ্যে আর খুঁজে পেলাম না। আমাকে সকাল সাতটার আগে প্রাতরাশ সেরে একটা পর্য্যন্ত হাঁসপাতালে, লাইব্রেরীতে, ক্লাসে—যখন যেখানে ডাক পড়ে, যেতে হয়। সারাদিন মড়া ঘেঁটে, রোগী দেখে বেড়াই। একটায় বাড়ি ফিরে লাঞ্চটি কোনোমতে গলাধঃকরণ ক'রে আবার ছুটতে হয়। আসতে যেতে মাঠটা পার হ'তেই আমার অবসর ঘন্টার অর্দ্ধেকটা যায় কেটে। বিকেলেও পাঁচটার আগে কদিনই বা বাড়ি ফিরতে পারি? সারাদিনটা অপর্ণাকে একলা থাকতে হয়, সেকথা ঠিক। বেড়াল যদি ভালো লাগত, সেটা সঙ্গে থাকলে খুসি হবার কথা ওরই, কিন্তু ভালো যখন বাসেই না, নিঃসঙ্গ বাড়িতে সেটা ওকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে মাত্র। সাত-পাঁচ ভেবে মনে মনে বললাম—যাক্‌গে, একটা ফাঁদই না-হয় কিনে আনব।

দিন-দুই পরে দুপুরে খাবার সময় অপর্ণা একটু ইতস্তত ক'রে বললে—'জেসি বলছে, দেখাশুনা যা করবার ও-ই করতে পারবে। আর, প্রথম থেকেই অভ্যেস করালে নাকি তেমন বিরক্তও করে না—রান্নাঘরেই আগুনের ধারে থাকবে চুপচাপ শুয়ে—'

অন্যমনস্কভাবে বললাম—'কে থাকবে শুয়ে?'

অপর্ণা মিছামিছি রেগে উঠে বললে—'বা রে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?'

—'তা, তুমি আর একটু বিশদ ক'রে না বললে স্মরণ তো হচ্ছে না—সুশীল নাকি?'

অপর্ণা শাসিয়ে বললে—'আমার দাদার তো ভারি দায় পড়েছে তোমার রান্নাঘরে এসে শুয়ে থাকতে। সাধে কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না খাবার সময়? এদিকে খাচ্ছ আর মনে মনে হাঁসপাতালের কথা ভাবছ।—যখন-তখন যাকে তাকে নিয়ে—'

—'আচ্ছা, আচ্ছা—আর বলব না। বাপ, যেন আগুনের ফুল্‌কি, খপ ক'রে এত গরম হ'য়ে উঠতেও পারো তুমি!'

—'গরম হই সাধে? আমি এলুম কাজের কথা বলতে—যাক এখন তোমার মত আছে কি না বলো।'

—'জান না তো ডাক্তারি পড়ার হাঙ্গাম কত। একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাশা করতে না পেলে একেবারে যে "শুষ্কং কাষ্ঠং" ব'নে যাই!'

—'কেন পড়তে এলে ডাক্তারি? কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি—'

—'কী ক'রে জানলে দেয়নি? কিন্তু—কার কথা বলছিলে তুমি?'

—'বেড়াল গো বেড়াল! তোমার সাধের ম্যাস্কট। পুষতে চাও তো নিয়ে এস গে এবার—'

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম—'তাই বলতে হয় এতক্ষণ। কিন্তু সে তো চুকে-বুকে গেছে—'

অপর্ণা কথাটা কানে তুলল না।—'জেসি বলছে উইলিয়ামসন আর রাখতে চায় না—হয়ত কাউকে দিয়ে দেবে—'

—'আচ্ছা, আজ কলেজ থেকে ফেরবার পথে ব'লে আসব এখন! কিন্তু দেখো, তোমার অমতে আমি জোর ক'রে কিছু করতে চাই না—'

অপর্ণা একটা বিতৃষ্ণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'নাঃ, এনো। ওটা নিশ্চয় আমার ধার দিয়েও যাবে না, দেখো তুমি। জেসি বলে যে, ওরা নাকি ডিস্‌লাইক্‌ বুঝতে পারে।'

মুদি উইলিয়ামসনের ছোট মেয়ে লরা বেড়াল-বাচ্চাটিকে নিয়ে এলো। আমরা দুজনেই তখন বাড়িতে। লরা বেড়ালটাকে অনেকক্ষণ আদর ক'রে চুমো খেয়ে, বারবার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শেষটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় চ'লে গেল। বেচারি বোধ হয় নেহাৎ বাপের ভয়েই বাচ্চাটিকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ও যেতেই অপর্ণা নাক-মুখ সিঁটকে ব'লে উঠল—'মাগো, ইংরেজ মেয়েরা যেন কী! ওই নোংরা কালো বেড়ালটার মুখে মুখ দিয়ে চুমো দেয়! দেখতে মোটাসোটা সুন্দর হ'লেও না-হয় বুঝতাম—এইঃ, যা, পালাঃ এখান থেকে—ওগো, তোমার বেড়াল সামলাও তুমি, নইলে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

আমার একটু রাগ হ'ল। এ কী রকম নিষ্ঠুরতা! গম্ভীরভাবে জেসিকে ডেকে বললুম—'ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আর দেখো, রোজ তুমি বাড়ি যাবার আগে ওটাকে রান্নাঘরে বন্ধ করে যেয়ো, এ-ঘরে বা শোবার ঘরে যেন ঢুকতে না পায়।'

জেসি ধরতে যেতেই বেড়ালটা ছুটে সোফার নিচে গিয়ে লুকোল। জেসি এদিকে যায় তো ওটা যায় ওদিকে। শেষটা হায়রান হ'য়ে মুখ লাল ক'রে রুষ্ট স্বরে বললে—'এতটুকু দেখতে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে সয়তানি শিখেছ খুব। এটা ভোগাবে, ম্যাডাম—'

অপর্ণা এতক্ষণ চুপ ক'রে ব্যাপার দেখছিল। আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে উঠে এসে বললে—'সোফাটা সরাও দেখি জেসি, ধরো তুমি ওদিকটা, আমি এদিকে আছি।—শুনছ, এবার তুমি গিয়ে ওটাকে নাও।' সোফা সরাতেই বেড়াল ছুটে কাবার্ডের পেছনে গিয়ে ঢোকে। সেখান থেকে ওকে বা'র করে সাধ্য কার? লাঠি, ছাতা, 'পোকার'—হাতের কাছে যেখানে যা পাই তাই দিয়ে খোঁচাখুঁচি ক'রে দেখা গেল, কিন্তু ভয় দেখিয়ে কিছুতেই ওটাকে বের করা গেল না। জেসি ঘন্টাকয়েকের জন্যে কাজ করতে আসে, যথাসময়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালে বসবার ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। দাঁড়ানো যায় না—এমন!—বাড়িতে আমিই সকলের আগে উঠি—জেসির আসতে এখনো ঘন্টাখানেক। এই এতক্ষণ ওই—না, অপর্ণা উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। তাছাড়া আমিই বা আজ ওখানে ব্রেক্‌ফাষ্ট খাই কী ক'রে?—না, রান্নাঘরে গিয়েই বসি ; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল, ওটা তো কা'ল থেকে কিছুই খায়নি—দুধের লোভেও বেরিয়ে আসেনি, এত ওর ভয়। একবার গিয়ে দেখতে হচ্ছে—নইলে অতটুকু বাচ্চা—ক্ষিধেয় আর শীতে ম'রে যেতে কতক্ষণ?—শেষে সক ক'রে প্রাণিহত্যা করব?—ফিরতে দেখি অপর্ণা বাথরুমের দিকে

চলেছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—'কি, জেসি তোমার খাবার ঠিক ক'রে রেখে যায়নি ও-ঘরে?' ব'লে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই ব্যস্ত হ'য়ে দেখতে গেল, কিন্তু দোরের চৌকাট থেকেই ছিটকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—'এত ক'রে বারণ করলুম—কিন্তু গরিবের কথা ফলে বাসি হ'লে—নাও, সামলাও এবার ঠেলা—আমি বাপু চললাম সোজা স্নানের ঘরে।'

অপরাধী আমিই, কাজেই বাধ্য হ'য়ে ঠেলা সামলাতে চললাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুরুশ, ছেঁড়া ন্যাকড়া যা পাই নিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে চললাম। অপর্ণা পেছন পেছন এসে বললে—'ও কি, তুমি কি সত্যিই নিজের হাতে ও-সব পরিষ্কার করতে চললে নাকি?'

—'তা না তো কি?'

—'কেন, জেসি রয়েছে কী করতে?'

—'তোমার যেমন কথা! আজ ওকে দিয়ে এসব করালে কালই ভাগবে না ও? মেড বদ্‌লে বদ্‌লে এমনিতেই তো হায়রানি—'

ওই আবহাওয়ার মধ্যে বেশিক্ষণ আর বাদানুবাদ না ক'রে লেগে গেলাম। অপর্ণা খানিক চুপ ক'রে থেকে আমার সাম্‌নে এসে হাত ধ'রে বললে—'দাও আমায়।'

অবাক হ'য়ে বললাম্—'সে কি?'

—'কিচ্ছু না—ক্লাসের দেরি হ'য়ে যাবে, যাও তুমি—'

—'কিন্তু অনু—'

অপর্ণা অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে—'বলছি যাও, কেন মিছে বকাচ্ছ আমাকে এই গন্ধের মধ্যে?'

অগত্যা আমি রান্নাঘরে গ্যাস্-রিং জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করতে গেলাম। মনে মনে এত মায়া হয়—!—অপর্ণা চিরকালই ঐরকম—সেই ছেলেবেলা থেকে জানি তো ওকে! মুখে ঝগড়াঝাঁটি, চোখা চোখা কথা—যেন কত রাগ করেছে, কিন্তু ভেতরটা একেবারে ফুলের মত কোমল। আমার ক্লাসের দেরি হ'য়ে যাওয়া ওর ছল, ও-কাজ আমাকে করতে দেবে না—এই হ'ল আসল কথা। কিন্তু সে মনোভাবটা চাপা দিতে না পারলে ওর ভারি লজ্জা।—উনুনে মস্ত দুই কেৎলী জল চাপিয়ে সাতপাঁচ নানান কথা ভাবছি, এমন সময় ও-ঘর হ'তে ডাক এলো—'শুনে যাও—'

—'ব্যাপার কি?'

—'বেশি নোংরা করেছে এই কাবার্ডের পেছনে—ওটা না সরালে কোনো উপায় দেখছি না সাফ করবার—'

—'তাই তো, তাহ'লে জেসি আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়—'

—'কিন্তু বেড়ালটা গেল কোথায়? পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো?'

—'পালাবে কোথায়? আছে ওইখানে কোথাও—'

—'কিন্তু দেখতে হবে না? সারাদিন কোণে কোণে লুকিয়ে থাক্—তারপর রোজ রাত্তিরে যতসব সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় এই কাণ্ড ক'রে বেড়াক্ আর কি। লোকজন এলে বসাবে কোথায়? দুদিন পরে তোমার বাড়ির ছায়াও মাড়াবে নাকি কোনো ভদ্রলোক?'

—'তুমিও যেমন পাগল! ক্ষিদের জ্বালায় ওটা আপনিই বেরিয়ে আসবে—'

—'মনে তো হয় না। আচ্ছা, দেখই না বের করতে পারো কি না—'

এদিক-ওদিক খুঁজে দেখা গেল, বেড়ালটা পিয়ানোর নিচে পাদানির কাছ ঘেঁষে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে। হাত বাড়াতেই শুড়ুৎ ক'রে সোফার নিচে ঢুকে পড়ল। আর তাড়া না ক'রে বললাম—'থাক্ গে এখন, যত ছুটোছুটি করবে, ওটা ততই ঢুকবে কোণে গিয়ে।'

দুপুরে খেতে এসে দেখি বাচ্চাটাকে তখনও বা'র করতে পারা যায়নি। চিন্তিত হ'য়ে বললাম—'তাই তো, না খেয়েই মারা যাবে নাকি?'

অপর্ণা হেসে বললে—'বিলিতি বেড়ালও "কালা আদমী" চেনে না কি গো?'

—'অসম্ভব নয়। যা মজ্জাগত প্রেজুডিস এদের।—কুকুর-বেড়ালেও ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ?—আমি বলি কি অনু, বরং লরাকেই ডেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাক্—তুমিও তো আর সত্যিই বেড়াল ভালোবাসো না—'

—'তাহ'লে তো আপদ যায়। ওটা বিদায় হ'লে বাঁচি। কিন্তু জেসি বলছিল কি জানো? আস্তে আস্তে নাম ধ'রে ডাকলে নাকি বাগ মানতেও পারে—'

—'হয়েছে, ওর নাম জিজ্ঞেস করবার জন্যে ছুটতে হবে না কি আবার সেই মুদির দোকানে?'

অপর্ণার মুখে দুষ্টুমির হাসি।—'কেন, বেড়াল পোষার মজাটা একটু টের পেতে হবে না? হায়রান হ'লে চলবে কেন—এরই মধ্যে?' তারপর গম্ভীর হ'য়ে বললে—'আচ্ছা তুমি খেতে বসো। আমি দেখি, যদি কোনোমতে বের করতে পারি।' মনে মনে হাসলাম। কেন—বলছি পরে।—

অপর্ণা একখানা প্লেটে খানিকটা দুধ ঢেলে নিয়ে মেজেতে ব'সে বেড়ালছানাকে আহ্বান করতে লাগল—'পুসি, পুসি—টনি—ববী—চিচিং ফাঁক—?—নাঃ—কোনো নামেই তো সাড়া দেয় না—ভালো বিপদেই পড়া গেছে! এই লক্ষ্মীছাড়া বেড়াল কোথাকার—বেলেল্লামি রেখে আসবি তো আয় বলছি—জলদি—নইলে দেবো হাড় গুঁড়ো ক'রে—'

—'থাক্‌গে অনু, তুমি খেতে এসো এখন—'

—'দাঁড়াও। আয় মিনি—মিনি—মিনু!'

—'মি-উ!'

—'ওমা—সাড়া দিচ্ছে—দেখেছ? মিনু—মিনু—আয়, আয় মিন্—মিন্ মিনু!' প্লেটখানা সোফার কাছে রেখে আবার আরও নরম সুরে ডাকল—'মি-নু!'

—'মী—উঁ!'—ভয়ে ভয়ে মাথাটা একটুখানি বের ক'রে প্লেটে মুখ দিতেই খপ ক'রে ধ'রে অপর্ণা বললে—'ব্যস্, ধরেছি। হ'ল তো এবার? নাও তোমার বেড়াল—'

আমি হাতটা ঠেলে দিয়ে বললাম—'চাইনে এমন দুষ্টু বেড়াল—বলো জেসিকে ফিরিয়ে দিতে—'

—'এক্ষুনি তো আর ফিরিয়ে দিতে পারছ না? ধরো ততক্ষণ—দেখো, ছেড়ে দিও না যেন! আমি দড়ি নিয়ে আসি ও-ঘর থেকে।'—

বিকেলে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে অপর্ণা হঠাৎ বললে—'কোনো নামেই সাড়া দিল না —মিনু ডাকতেই বেরিয়ে এসেছে—ভারি মজা! ওটার নাম মিনু নয় তো?'

—'হবে।'

খানিকক্ষণ পরে অপর্ণা আবার বললে—'তা হ'লে মিনুই থাক্ ওর নাম?'

কোটের বোতামের দিকে চোখ রেখে নিরুৎসুক কণ্ঠে বললাম—'নামটামে আর কাজ কি? দিয়েই যখন দেব—'

—'হুঁ—'

দিন-দুই পরে একটু শীগ্‌গির ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি—অপর্ণা সাম্‌নের সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনী মিসেস হল-এর সঙ্গে কি যেন বলছে। আমাকে দেখেই চুপ। মিসেস হল হেসে শুভ-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—'আপনার স্ত্রীকে বলছিলাম, বেড়ালকে এখন থেকেই সব অভ্যাস না করালে পরে ভারি বেগ পেতে হবে—'

—'ও, তাই নাকি? ধন্যবাদ—'

অপর্ণার চোখে চোখ পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ভেতরে আসতে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠল—'আমি তখনই জানতুম যে, এ বেড়ালের ঝক্কি সব পড়বে শেষটা আমারই ঘাড়ে। মিসেস হলকে জিজ্ঞেসা না ক'রে করি কি? কোণে কোণে নোংরা ক'রে রাখাটা কি খুব ভালো কথা?'

—'নিশ্চয়ই না। কিন্তু ওটাকে যে ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল? জেসি গেল না কেন?'

ও মুখভার ক'রে বলে—'সে তুমি জানো, আর জানে তোমার জেসি। উইলিয়ামসনের তো ভারি ব'য়ে গেছে কি না একবার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে। একটার বেশি বেড়ালকে খাওয়াবার খরচ গায়ে লাগে না ওদের? যা কৃপণের জাশু সব-

আমাকে বাধ্য হ'য়ে রোজ অনেক রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয়। মাঝে মাঝে অপর্ণাও জাগে। এটা ওর খেয়াল, কিন্তু বারণ ক'রে দেখেছি—নিষ্ফল। অগত্যা আমি হাল ছেড়ে দিই। খাবার ঘরে আগুনের কাছাকাছি টেবিল আর দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে যে যার কাজ করি। এগারোটা না বাজতেই অপর্ণা ঢুলতে সুরু করে এবং আস্তে আস্তে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। রো—জ। রাত জেগে পড়তেই পারে না ও—তবু —জেদ। —সেদিনও এমনি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে এক-একবার চোখ বুঁজে আসে। হঠাৎ চেয়ে দেখি, মিনু অপর্ণার চেয়ারের নিচে লুটিয়ে-পড়া লম্বা বেণীটা নিয়ে থাবা দিয়ে দিয়ে খেলা করছে। বেণীর আগায় বাঁধা দোদুল্যমান রঙীন রিবনের ফুলটাই ওর কৌতূহল উদ্রেক করেছে। এরকম খেলা করতে দেখতে খুব ভালো লাগে কিন্তু ভয় হ'ল পাছে ও জেগে ওঠে—তাই আস্তে রুলারখানা দিয়ে এক তাড়া করতেই মিনু কিন্তু ভয়ানক ভয় পেয়ে তড়াক্ ক'রে একেবারে অপর্ণার ঘাড়ে। ও চম্‌কে জেগে ঝেড়ে ফেলে দিতে যায় : কিন্তু মিনু ভয়ে চারখানা পায়ের সব ক'খানি ধারালো নখ বের ক'রে অপর্ণার কাঁধ আঁক্‌ড়ে ধ'রে রইল।

—'কি এত হাসছ বলো তো? ভা—রি মজা—না? শীগ্‌গির ছাড়িয়ে দাও, নইলে কিন্তু খুন ক'রে ফেলব তোমার বেড়ালকে।'

—'বেড়াল আমার, না তোমার? আমার কোলে চড়তে দেখেছ একদিনও? ওটা তোমাকেই ভালোবাসে বেশি—'

—'চাইনে অত ভালোবাসা'—জোর ক'রে নামাতে গিয়ে মিনু আরো ভয় পেয়ে ওর ড্রেসিং-গাউন ধ'রে ঝুলতে থাকে।

শুতে যাবার আগে অপর্ণা মিনুকে আগুনের ধারে একটা কাঠের বাক্সে রেখে দিল

বললুম—'ইস্ এ যে রাজশয্যা! এই-না তুমি বেড়াল ভালোবাসো না?'

—'ভালোবাসার জন্যে তো এত কাণ্ড করিনি! বেড়াল যদি রাখতেই হয়—'

আমি নিরীহভাবে বললাম—'তাহ'লে লরাকে আর খবর দিয়ে কাজ নেই—রাখবেই যখন—কি বলো?'

অপর্ণা হেসে ফেলে বললে—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ—রাখব। তুমি যে কতই খবর দিতে লরাকে তা কি আমি এঁচে নিইনি মনে করো নাকি? স—ব তোমার চালাকি—আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে বেড়ালটাকে।'

যাক—ফাঁড়া তো কেটে গেল উপস্থিত।

বাস্তবিক আমি জানতাম যে, অপর্ণা যখন দেখবে একটা প্রাণী বোবা—অসহায় —কেউ বরদাস্ত করতে পারছে না—যেন বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে—তখনই ওর দরদ হবে—দুর্ব্বলের উপর দয়ার্দ্র শক্তিমানের দরদ। বুদ্ধিমতী জেসিকে একটু ইসারা করতেই সেও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে অনাদর আর তাচ্ছিল্য দেখিয়ে মিনুকে দূরে রেখেছিল। বেড়ালটাও কম শেয়ানা নয়। ক্ষিদে পেলে অপর্ণার কাছে গিয়েই মি মি করে —ভুলেও আমার কাছে আসে না। ওরই পায়ের উপর মাথা ঘ'ষে, পার্ র্—পার্—র্; সামনে শুয়ে প'ড়ে ডিগবাজি খেয়ে, কখনো বা চিৎ হ'য়ে চারটি পা উপরদিকে তুলে —ছোট্ট ঘাড়টি বেঁকিয়ে নরম ছোট্ট দেহে নানান ভঙ্গি ক'রে আদর কাড়বার সে কী হাজারো চেষ্টা! অপর্ণার যখন-তখন-দোদুল্যমান বেণীখানি আর কোমল উষ্ণ কোলটির উপর মিনুর সব চেয়ে লোভ। সুবিধা পেলেই এই প্রিয় জিনিষদুটি আক্রমণ ও দখল করবার আগ্রহের ওর সীমা নেই। ফলে, গোলাপী নাকের উপর তর্জ্জনীর তাড়নায় খানিকক্ষণের জন্যে ওর সেই প্রথমদিনকার দুর্গ কাবার্ডের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবার একটু পরে নিজেই বেরিয়ে আসে। আজকাল আর ওকে বের করবার জন্যে নানান্ ফন্দি-ফিকির খুঁজে বেড়াতে হয় না।

দেখতে দেখতে মিনুর গলায় বাঁধবার জন্যে রঙীন রেশমি ফিতে, লোম পরিষ্কার করবার বুরুশ, গায়ে মাখাবার পাউডার, খেলা করবার ছোট ছোট বল—কত কী যে আমদানি হ'তে লাগল! দেখে-শুনে আমি তো অবাক! একদিন থাকতে না পেরে বললাম—'এতও তোমার মাথায় আসে! কী শোরগোলই তুলেছিলে প্রথম দিন যখন ওটাকে আনবার কথা বলেছিলাম—শুধু কাঁদতে বাকি—আর এখন এসব কী হচ্ছে?'

—'দেখতেই তো পাচ্ছ। তুমি যখন বাড়ি থাকো না তখন ওটাই আমার একমাত্র

সাথী বলতে সাথী, দোসর বলতে দোসর ;—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে ভালো লাগে কখনো?'

—'তাই বলে পাউডার!!'

—'পাউডার মাখালে মিনুকে কী সুন্দর যে দেখায়—দেখবে? মিনু, মিনু—আয় এদিকে।....ব্যস, এই দেখ এখন কেমন দিব্যি দেখাচ্ছে—এই, নড়িস্‌নে—দুষ্টু!'

যতবার পাউডার মাখায়, মিনু ততবারই গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়, নয়তো তাড়াতাড়ি জিভ দিয়ে চেটে লোম পরিষ্কার ক'রে ফেলে। কিন্তু অপর্ণারও জেদ—মিনুকে পাউডার মাখিয়ে, গলায় লাল রিবন পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট পটের বিবিটির মত ব'সে থাকতে শেখাবেই—তা মিনুর যতই কেননা আপত্তি থাক্।

—'ওগো, দেখছ, কান ম'লে দিলে ও ঠিক বুঝতে পারে যে, এমন একটা কিছু করছে যা আমি পছন্দ করি না। এমনি শাস্তি আর আদরের ভেতর দিয়েই আস্তে আস্তে সব অভ্যেস করাতে হয়—জানো?'

—'জানি, কেবল কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিতেই বা বাকি কেন এইটেই যা জানি না। ওটাকে তো বালগোপালের বিগ্রহের সামিল ক'রে তুললে। আসল কথাটা কি বলব?—তোমার মত মেয়েরা বড্ড একষ্ট্রিমিষ্ট। এই ঘেন্নার অন্ত নেই তো একটু পরে ভালাবাসায়ও নাজেহাল।'

—'তুমি বোধ হয় ভুলেই গেছ যে, ছোট থেকে বাড়িতে ওরা বেড়াল নিয়ে আমাকে কেবল ভয়ই দেখিয়েছে—কখনো কি একটু খেলা করবার সুযোগ পেইছি? গায়ে হাত বুলিয়ে একবার আদব পর্য্যন্ত না। অন্য কেউ করলে—যেমন আমার বোন চিনু—জানো তো ওর পেছন পেছন ছায়ে-মায়ে একপাল বেড়াল চলত দিনরাত? বেচারি কি ভালোই বাসত কুকুর-বেড়ালকে!—আমার কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য লাগত যে, কী পায় লোকে বেড়ালের মধ্যে অত আদর করবার! হয়েছে কি--', অপর্ণা দম নিয়ে বলল, ওর খেই হারিয়ে—'আমার ঘেন্নাটা স্বাভাবিক ছিল না।'

—'কোনো ঘেন্নাই, স্বাভাবিক নয় অনি। কোনটা ঠিক স্বাভাবিক আর সত্যিকার বৃত্তি আমাদের, তা যদি বলতে যাই, তুমি এখনই ব'লে বসবে—ঐ গো গুরুমশায়ের মত কপিবুক ম্যাক্সিম আওড়াচ্ছে দেখ! যাক্, তুমি যে খুসি হয়েছ, তাতেই আমি নিশ্চিন্তি! কিন্তু দেখো, যত্ন আদর সবটার দখলী যেন একা তোমার মিনুর ভাগে না পড়ে—এই বেচারার—'

অপর্ণা ধমক দিয়ে বললে—'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে—আর ফাজলামো করতে হবে না মশায়। তুমি পড়ো এখন, আমি মিনিকে নিয়ে ও-ঘরে যাচ্ছি।'

তারপরে—কত বছর হ'ল দেশে ফিরে এসেছি। বয়সের নদীতে জোয়ার ক্রমেই আসে ঢিমিয়ে, ভাঁটাই বুঝি বা একটানা হয় শেষে—তবু সেদিনের কথা মনে হ'লে আজও বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। মনে হয়, মিথ্যে এ জীবন, ভুয়ো, জীবনের মালমশলা, কাণ্ডকারখানা সবই বুঝি বা ভোজবাজি—মরুভূমির মরীচিকার মতই ক্ষণস্থায়ী। সেই অপর্ণা, সেই মিনু—আজ কে কোথায় যে! সেই আমিই কি আছি? অন্তরে বাইরে কত

পরিবর্ত্তন।—হঠাৎ দেখলে অপর্ণাই হয়ত আজ ওর স্বামীকে ঠিক চিনতে পারত না—কে বলতে পারে?

তবু, চোখ বুঁজলে আজো মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই '—' সহরে আমাদের সেই ছোট্ট ফ্ল্যাট্‌খানা, তার প্রতি কক্ষ, প্রত্যেকটি আস্‌বাবপত্র ; জেসি, মিনু ; অপর্ণার দুটি কাজল কালো অতল চোখ, হাস্যোচ্ছল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, স্নেহ মধুর পরশখানি। ছোট্ট একটা বেড়ালছানা নিয়ে দুজনের সেই আমাদের ছেলেমানুষি ঘরকন্না, কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা, অপর্ণার আদর-আব্দার, মান-অভিমান ; ছুটির দিনে মাঠে-মাঠে, পাহাড়ে, নদীর ধারে—দূরে সমুদ্রের তীরে গিয়ে পিক্‌নিক্।—ঝরণার জলের মত গান গেয়ে গেয়ে স্বচ্ছ সুন্দর অবাধ গতিতে ব'য়ে চলেছিল জীবনের ধারা। থেকে থেকে ভবিষ্যতের জন্যে কতই জল্পনা-কল্পনা—তার একটা জীবন্ত টুকরোও কি আজ রইল না?—

জানি না কী গ্রহবৈগুণ্যে আমার খেয়াল হ'ল যে, নিউহেভ্‌নের কাছে সমুদ্রতীরে একটা ছোট্ট গ্রামে দিনকয়েকের জন্যে বেড়াতে যাবো। তখন আগষ্টের শেষ, ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম (বা বসন্ত) অবসান-প্রায়, গাছের শুক্‌নো পাতা ঝরার সবে সুরু, হাওয়াতে পরিবর্ত্তন টের পাওয়া যায়, কিন্তু শীত আসবার এখনো দেরি। এখনো সারা সেপ্টেম্বরটা সাম্‌নে, অক্টোবরের আগে তেমন ঠাণ্ডা কি আর পড়বে? আকাশ এখনো সুনীল, সূর্য্যের কিরণ প্রায় তেম্‌নিই উজ্জ্বল, ফোটা ফুলের হাসির লয়ে 'সম্' আসেনি গৃহস্থদের উদ্যানে উদ্যানে। এই তো ওদের হেমন্ত—মোটে সুরু—যাওয়া ঠিক ক'রে ফেললাম। অপর্ণার তখন দারুণ ভাবনা হ'ল—ওর মিনুকে নিয়ে করা যায় কী? সঙ্গে নেওয়া তো অসম্ভব। বাড়িতে ফেলে যাওয়া মানে জ্যান্তে কবর দিয়ে রেখে যাওয়া—না খেতে পেয়ে মারা যাবেই। বাংলাদেশ নয় এ—যে পড়শীরা মাছের কাঁটাটুকুও জোগাবে!

দুজনে মিনুর একটা আশ্রয় খোঁজবার জন্যে একবার উইলিয়ামসনের দোকানে, একবার বন্ধুদের বাড়িতে ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াতে লাগলাম। অবশেষে আমারই এক সহ্‌পাঠী বন্ধু—ডাক্তার সাইগল—খবর দিলেন যে, ওঁর ল্যাণ্ডলেডি মিনুকে রাখতে রাজি--যদি তার খোরাকি দেওয়া হয়। অপর্ণা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি! —'ডক্টর সাইগল—মিনু—মাগো মা! এমন কথা শুনেছেন কোথাও? বেড়ালের ল্যাণ্ডলেডি! হি, হি—আবার খোরপোষ চায়—Board and Lodging for a Cat—রুম দেবে মিনুকে—একটা কাঠের বাক্স—হোঃ, হোঃ—খেতে দেবে কি? না, একপেনির হেরিং—ডক্টর—'

বেচারি সাইগল অপ্রস্তুতভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি অপর্ণাকে একটু ধমক দিয়ে বল্লাম—'কী এত হাসো? হেরিং কেন খেতে দেবে? হেরিংএ কাঁটা কত ওরা জানে না?—আর পয়সা না দিলে রাখবেই বা কেন শুনি—বেড়াল পুষতে খরচ নেই মনে করো নাকি? ভুলে যেও না যে—'

'এটা বিলেত দেশ'—ধমক খেয়ে অপর্ণা হাসি চেপে চোখমুখ মুছতে মুছতে বললে—'না, ভুলব কেন? ভুলিনি যে, এখানে পয়সাই হচ্ছেন সর্ব্বার্থসাধিকা। ভুলতে কি পারি? তা, চলো—গিয়ে মিনুর ভবিষ্যৎ আবাস দেখে আসিগে। এই মিনু, চল্‌রে—দেখবি তোর নতুন আস্তানা—মনে ধরলে তবে তো। কিছু মনে করবেন না ডক্টর—'

—'বা, আমি কেন কিছু মনে করব মিসেস রায়? এদেশে সব ব্যাপারেই এমন, জানেনই তো।'

আমি প্রাঞ্জল সুরে বললাম—'পয়সা না হ'লে ওরাই বা দুধ, মাছ এসব পাবে কোত্থেকে? এক পেনিই হোক বা দু পেনিই হোক, নিজের পকেট থেকে দিতে সবারই গায়ে লাগে।'

অপর্ণা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ডাক্তার সাইগলের ল্যাণ্ডলেডির বাড়ি কাছেই। গেলাম তিনজনে মিনিকে নিয়ে। বরাবর তেতলায় ফ্ল্যাটে থেকে এসেছে—হঠাৎ রাস্তায় নেমে মিনুর যা ভয়!—লম্বা লম্বা নখ বার ক'রে অপর্ণাকে আঁকড়ে ধ'রে রইল। মোটর চললে বা অন্য কোনো শব্দ হ'লে ঘাড় বেয়ে মাথায় চড়বার উপক্রম করে। ওর আঁচড়-কামড় সহ্য ক'রে কোনোমতে টম—মিসেস টমের বাড়ি পৌঁছানো গেল। বুড়ি মিনুকে দেখেই বললে—'এ যে রাশিয়ান-ক্যাট্, তাই লোম অত লম্বা আর নরম—একেবারে "ফার্"-এর ম'ত।'

অপর্ণা বললে—'তাই নাকি? আমি তো জানতুম পার্শিয়ান ক্যাট্ ব'লে এক জাত আছে—রাশিয়ান তো কখনো শুনিনি—'

—'হ্যাঁ মিসেস, আমি সব জানি—ছেলেবেলা থেকে—'

মিসেস টমের কথা শেষ হ'তে পেল না—হঠাৎ ঘরের মধ্যে ফোঁশ ফোঁশ শব্দ! ফিরে দেখি, মিনু, সজারু হ'য়ে পিঠ উঁচু ক'রে যোদ্ধৃবেশে লেজ নেড়ে একটা কালো বেড়ালের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে, আর সে বেচারা ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে কোথায় লুকোবে ভেবেই পাচ্ছে না। মিসেস টম তাড়াতাড়ি সেটাকে কোলে তুলে নিয়ে সোফার এককোণে দিলে বসিয়ে। ডাক্তার সাইগল জনান্তিকে বললেন—'মিসেস টমের বেড়াল, মিষ্টার রায়। বুড়ি আপনাদের মিনুর ওর "ব্ল্যাক্ ফুটে"র ওপর নিষ্করুণ ব্যবহার দেখলে আর ওকে ঘরে ঠাঁই দিতে চাইবে না।'

কিন্তু মিনুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না, যতবার ঠাণ্ডা করা হয়—ততবারই ও গিয়ে কালো-বেড়ালকে আক্রমণ করে আর কি। অবশেষে ডাক্তার সাইগল যা ভয় করেছিলেন, তা-ই্ হ'ল। টমদের ঘরে মিনুর ঠাঁই হ'ল না।

এদিকে আমাদের আর দেরি করবার উপায় নেই। অগত্যা কুকুর বিড়ালের 'হোম'-এ (Cats' and Dogs' Home) টেলিফোন করতে হ'ল। সেখানে হারিয়ে-যাওয়া কুকুর-বেড়াল যেমন রাখে, তেম্নি—সপ্তাহে কয়েক শিলিং করে দিলে—কোনো বাড়ির কর্ত্তা বা কর্ত্রীর কোথাও যাবার দরকার হ'লে, তাদের পোষা জানোয়ারও রেখে দেয়।—একটা লরিতে অনেকগুলো খাঁচা নিয়ে 'হোম' থেকে লোক এলো। ওদেরই একটায় মিনুকে ঢুকতে হবে। মিনু কিছুতেই খাঁচায় ঢুকতে রাজি নয়, শেষটা ড্রাইভার হর্ণ দিতে ভয় পেয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর লরি চলার সঙ্গে সঙ্গে মিনুর সে কী কাৎরানি আর চেঁচামেচি! অপর্ণা দুঃখিত হ'য়ে গার্ডকে ডেকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলে যেন সাবধানে রাখে ও ভালো ক'রে খেতে দেয়। সে তো খুব আশ্বাস দিয়ে চ'লে গেল।

অপর্ণা বললে—'দেখ, মিনুটা গিয়ে ঘর যেন খালি হ'য়ে গেছে। সারাদিন বাড়িতে

ছোট্ট ছেলের মত দুরন্তপনা ক'রে বেড়াত।—আমরা আজ দুপুরের গাড়িতে গেলেও পারতাম।'

—'না, বড্ড তাড়াহুড়ো হবে। কিন্তু একটা বেড়ালের ওপর এত মায়া, যখন—'

অপর্ণা হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললে—'থাক, সেদিন আমার কখনো হবে না। কিন্তু মমতা মাত্রেই কত মারাত্মক দেখছ তো? আমার কেন জানি না, ভারি মন কেমন করছে—মনে হচ্ছে, না গেলেও হ'ত।'

তারপর?—

তারপর আর কি! নিউহেভনের কাছে সেই গ্রামে শুধু দশটা দিন আমাদের নিশ্চিন্ত আরামে কেটেছিল। আমরা একলা ছিলাম না—সঙ্গে আরো দু-একজন বাঙালী ছেলে-মেয়ে। তাঁরা সকলে মিলে একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতেন—শুধু আমি আর অপর্ণা সমুদ্র-তীরবাসিনী এক বৃদ্ধার কুটীরে দুখানি ঘর নিয়ে একটু দূরে থাকতাম। সারাদিন দলের সঙ্গে এখানে ওখানে—কখনো ব্রাইটন, কখনো নিউহেভ্‌নে ঘোরাফেরা ক'রে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স'রে পড়তাম এবং নির্জ্জনে সমুদ্রতীরে গিয়ে চুপ ক'রে শুনতাম তার নীল কল্লোল। অন্ধকারে কখনো বা ঝড় মতন উঠলে সমুদ্রের গর্জ্জন ও মাতাল হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে ভয় পেয়ে এক-একদিন অপর্ণা ব্যাকুল বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরত। স্বপ্ন ভেঙে আমি ওকে কাছে টেনে নিতাম!—'ভয় কি অনু, ভয় কি—'

—'ওগো--'

—'সত্যেন বলো—সত্যেন—এখানে তো আর কেউ শুনছে না।'

—'দেখ—দেখ, সমুদ্র ঠিক যেন আমায় গিলতে আসছে—কী ভয়ানক!'

—'সব কল্পনা, অনু। এখানে সমুদ্রতীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে ভরা—ঢেউগুলো তারই উপর আছাড় খেয়ে অতটা লাফিয়ে উঠছে। আচ্ছা, চলো বাড়ি ফেরা যাক।'—

এমনি এক সন্ধ্যার কনকনে হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে অপর্ণার শরীরটা একটু খারাপ হয়! আমাদের ল্যাণ্ডলেডি ওকে বললে আগুনের ধারে চুপচাপ ব'সে থাকতে এবং আমাকে বারণ ক'রে দিলে আজ যেন ওকে বাইরে টেনে নিয়ে না যাই—সময়টা ভালো যাচ্ছে না, এই-রোদ এই-মেঘ—যারা প্রকৃতিদেবীর এই খামখেয়ালিতে অভ্যস্ত নয়, তারা অসুখ-বিসুখ ক'রে বসতে পারে।

লাঞ্চ-এর পর হঠাৎ বন্ধু সতীশ এসে হাজির। বললে—আমাকে ওর সঙ্গে একবার ব্রাইটনে যেতেই হবে—সেনের বাড়িতে! দরকারটা কি শুনে অপর্ণা বললে—'যাবে না? মানে? আমি মিসেস মা'রের সঙ্গে বেশ থাকবো, ভয় নেই—একটু বৈচিত্র্য দরকারও তোমার।'

—'আপনিও চলুন না অপর্ণাদি, ডাক্তার সেন কত খুসি-যে হবেন—। প্রায়ই আপনার কথা বলেন।'

অপর্ণা আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি বললাম—'না, কাজ নেই। তুমি আজকের দিনটা বিশ্রাম করো—'

সতীশ জিজ্ঞেস করল—'কেন, কি হয়েছে?'

—'একটু সর্দ্দি মতন হয়েছে কাল থেকে—'

—'ওঃ—কিছু এসে যাবে না ওতে—অমন একটুখানি সর্দ্দি—'

অপর্ণা একটু ভেবে বললে—'থাক্‌গে—আজকের দিনটা না-ই বেরুলাম। তুমি শীলাকে বোলো আমার কথা।

ডাক্তার সেন শীগ্‌গির আমাদের ছাড়লেন না। বিকেলের দিকে বেরোতে যাব, এমন সময় বেশ খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল, তাই সেন-জায়া ধ'রে বসলেন গরম গরম হালুয়া খেয়ে যেতে আর এক এক কাপ চা। বলা বাহুল্য, বিলেতে এমন স্বাদু প্রস্তাব ছেড়ে সহজে কেউ ঠাঁইনাড়া হ'তে চাইল না।

সবে আমাদের 'বর্ষার' আসরটা জমে এসেছে, এমন সময় বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল —মিনিটখানেক পরেই ঘরে এসে ঢুকল—অপর্ণা। জামা-জুতো ওর ভিজে শপ্‌শপ্‌ করছে। ডাক্তার সেন তাড়াতাড়ি উঠে আগুনের ধারে একখানা চেয়ার টেনে এনে দিলেন, সেন-জায়া একজোড়া গরম বনাতের স্লিপার এনে জুতো মোজা খুলে ফেলতে ব'লে শুধোলেন, শাড়ীখানা আর ব্লাউজটাও ছাড়বে কি না।

—'কিচ্ছু দরকার নেই শীলা, সিল্কের জিনিষ—এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে সব। শুধু মোজাটা ছাড়া দরকার।' পরে আমার তিরস্কারভরা চোখের দিকে তাকিয়ে—'আমি মিছামিছি আসিনি, এই দেখ।' ব'লে একখানা টেলিগ্রাম দিল আমার হাতে। প'ড়ে দেখি, 'হোম' থেকে এসেছে। ওরা লিখেছে, মিনুর ভারি অসুখ, আর একটা বেড়ালের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভয়ানক কামড় খেয়েছে, পেছনে পায়ের কাছে খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে লাল দগ্‌দগে মাংস বেরিয়ে গেছে—বিনামেঘে বজ্র—বলে না?

অপর্ণা বললে—'তুমি এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবে চলো, লিখে দাও যে, আমরা এলাম ব'লে, এর মধ্যে ওরা যেন একটুও অযত্ন না করে।' তারপর শীলার দিকে ফিরে—'বেচারা কী কান্নাটাই কাঁদছিল খাঁচার মধ্যে ঢুকে! সখের কুকুর-বেড়ালকে কখনো ওসব হোম-টোমে পাঠাতে আছে? একটা-না-একটা গোলমাল হবেই হবে।'

সেন-জায়া বললেন—'কিন্তু একটা বেড়ালের জন্যে একেবারে এখান থেকেই চ'লে যাবে, অপর্ণা? খরচ দিলে ওরাই তো ডাক্তার ডেকে মিনুর দেখাশুনো করতে পারত—'

—'না ভাই, যাওয়াই ভালো। তা ছাড়া এখানে এত আগে থাকতেই যে-ঠাণ্ডা পড়তে সুরু হয়েছে—সমুদ্রের হাওয়াটাও এ-সময় ভালো নয়। যেতামই তো আর দিন-দুই পরে! —শরীরটাও আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না।'

রাগত সুরে বললাম—'তবু কেন হুড়মুড় ক'রে ঝড়ঝাপটায় ভিজতে ভিজতে এখানে এলে শুনি—এই খারাপ শরীরে? তুমি একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

—মিসেস সেন, ওকে একজোড়া গরম মোজা এনে দিন তো।...চলো সতীশ, টেলিগ্রাফ-অফিসটা হ'য়ে বাড়ি।'

পথে যেতে যেতে সতীশ জিজ্ঞেসা করলে—'তাহ'লে কবে যাবেন আপনারা?'

অপর্ণা বললে—'কালই। আমার আর একটুও ভালো লাগছে না—'

আমি বললাম—'দেখছ সতীশ, একদিন এই বেড়ালই ছিল ওর চক্ষুশূল—'

হেসে বললে—'আপনারা বুঝবেন কী বলুন—অন্যের জুতোয় কোথায় উঠল পাহাড়প্রমাণ ছোট্ট পেরেক—', সতীশ এমনিভাবেই ইংরিজি প্রবচনকে তর্জ্জমা না ক'রে ছাড়বে না। 'আই সি এস'-এর ছেলে স্বদেশী হয়েছে সবে—হবে না?

রাত্রে অপর্ণার বেশ একটু জ্বর হ'ল। তবু ও কিছুতেই আর দুদিনও থাকতে রাজি নয়—মিসেস মা'রে কত ক'রে বললেন, কিন্তু ওর সেই এক দুঃস্বপ্ন—দেরি হ'লে মিনু যদি না বাঁচে?

ট্রেন থেকে নেমে আমাদের ফ্ল্যাটে যখন পৌছলাম, ততক্ষণে অপর্ণার সামান্য সর্দ্দি-জ্বর রীতিমত ইনফ্লুয়েঞ্জায় বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বিপদের উপর বিপদ—সমস্ত সেপ্টেম্বরটা সমুদ্রতীরে কাটাব ভেবে জেসিকে এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। এখন খোঁজ ক'রে দেখা গেল, সে গ্রামে কোন্ এক মেসোর বাড়িতে মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে গেছে। অত অল্প সময়ের জন্যে অন্য মেড পাওয়া মুস্কিল। ওর মাকে বললাম চিঠি লিখে জেসিকে ঝটিতি আনাতে। ইতিমধ্যে সতীশ আর আমি নিজের হাতে সমস্ত কাজ করতে লাগলাম। দেখে অপর্ণা এক-এক সময় গোপনে উঠে নিজের দরকারি কাজগুলো নিজেই ক'রে রাখত। দুর্ব্বল শরীর আর সইবে কত? দেখতে দেখতে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্লুরিসিতে—প্লুরিসি নিউমোনিয়ায় দাঁড়াল।

বলতে ভুলে গেছি, বাড়ি ফিরে অপর্ণার আর তর্ সয়নি—এসেই মিনুকে হোম থেকে আনিয়ে নেয়। পালিনীকে ফিরে পেয়ে মিনুর যা আনন্দ—। বেচারা এই কদিনেই কী রোগা হ'য়ে গেছে—! অপর্ণা গায়ে হাত বুলিয়ে ছলছল চোখে বললে—'আহা, খেতে দেয়নি মোটে।—দেখেছ, কী হালকা হ'য়ে গেছে?—যেন শোলা!'

—'হ্যাঁ। কিন্তু দোষটা ওরই; জিজ্ঞেস করেছিলাম গার্ডটাকে, সে বললে যে, মিনুই সারাদিন প্রায় কিছুই খেত না, ডাকলে সাড়া দিত না, মাছ দুধ যেমন তেমনি নাকি প'ড়ে থাকত।'

—'সত্যি?—কেন?'

—'জিজ্ঞেস করো না মিনিকেই—বুঝতে পারছ না ওর কাণ্ড দেখে?'

অপর্ণা হাসল। বাস্তবিক, 'হোম' থেকে এসে পর্য্যন্ত মিনু পারতপক্ষে অপর্ণার বিছানা ছেড়ে কোথাও যায় না। অভ্যাসমত এক একবার বাইরে গিয়ে কাঠের বাক্সে মখমলের উপর ব'সে আবার সোজা ওরই ঘরে ফিরে আসে। ঢুকতে না দিলে বা দরজা খোলা না পেলে কাতরভাবে মি-মি করে, নয়তো দরজার কাছে চুপ ক'রে ধর্ণা দিয়ে ব'সে থাকে। তবু আর কোথাও যেতে চায় না।

তারপর—যেদিন অপর্ণাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল—আঃ কিন্তু থাক্—থাক্ সে

দিনগুলোর কথা—স্মৃতিও অতটা সইবে না, যদিও আজ আয়ুর অৰ্দ্ধেক এসেছে ফুরিয়ে।

চোদ্দদিন পরে অপর্ণাকে চিরদিনের মত বিদায় ক'রে সতীশকে বললাম—'ভাই, আমি দিনকতক অন্য কোথাও ঘুরে আসি গে। এই নাও এ-চেক্‌খানা--ফ্ল্যাট্‌টা ছেড়ে দিও যত শীগ্‌গির পারো। আর, ভালো কথা—জেসিকেও একবার খবরটা দিও।'

—'কিন্তু এটার কী ব্যবস্থা করলি'রে সত্যেন?'

—'কার কথা বলছ?'

—'এই যে তোদের—মিনুর—'

—'ওঃ'—আমি চোখ সরিয়ে নিলাম—

—'কোরো যা হয়—'

ওরই জন্যে অনুর সামান্য সর্দ্দিকাশি প্লুরিসির দিকে মোড় নেয়—একটা সামান্য—উপলক্ষ্য—বেড়ালের জন্যে!!

অক্টোবরের মাঝামাঝি সেশন আরম্ভ। সেই ক্লাস, লাইব্রেরি, হাঁসপাতাল—গতানুগতিক দিনগত পাপক্ষয়! ধারও ধারে না সে মানুষের অন্তর্জগতে সুবৃহৎ পরিবর্ত্তনের—বহির্জগৎ সেই একইভাবে একটানা ব'য়ে চলেছে। আবার ছুটি নিয়ে চললাম দখিনমুখো। এখানকার আকাশে-বাতাসে ওর স্মৃতি মাখানো—অসম্ভব, অসম্ভব এখন এখানে থাকা।—

যাবার আগে কি জানি কেন—হঠাৎ মনে হ'ল—একবার মিনিকে দেখে যাই। সতীশ ওর বাড়িতে নিয়ে রেখে দিয়েছে। ওর ল্যাণ্ডলেডি এসে বললে—'বড় লক্ষ্মী বেড়াল, আর এ—ত সুন্দর! আমার ছেলেমেয়েরা ভারি ভালোবাসে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মিষ্টার রায়, মিনু যে আপনার কিছুই খেতে চায় না!—আদর ক'রে ডাকলেও সাড়া দেয় না—কেমন যেন মনমরা হ'য়ে থাকে। দেখবেন একবার আপনি?'

ওর পেছন পেছন রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মিনু জানলার উপর চুপ ক'রে ব'সে। ভালো যে লাগছে না ওর, দেখলেই বোঝা যায়।

—'মিসেস রীড, আমি এক্ষুনি আবার আসছি।' ব'লে বেরিয়ে গেলাম : কাছেই এক মাংসের দোকানে গিয়ে দুপেনির কিমা-করা মাংস কিনে এনে মিনুকে নিয়ে এলাম সতীশের বসবার ঘরে। সাম্‌নে ধ'রে দিয়ে সোফায় ব'সে ওর খাওয়া দেখতে লাগলাম। মিনু দু-একবার মাংস শুঁকে দেখে আমার কাছে এসে পায়ের ওপর গা-মাথা ঘষতে লাগল। চিনেছে ও। একটু আদর ক'রে পিঠ চাপড়ে বললাম—'খা না মিনি!'

ফিরে আসবার সময় মিনু দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। মিসেস রীডকে ডেকে বললাম নিয়ে গিয়ে দোরটা বন্ধ ক'রে দিতে।

—'কিন্তু না খেয়ে আপনার বেড়াল যদি মারা যায় মিষ্টার রায়? আমরা যে কোনোমতেই বাগ মানাতে পারছিনি ওকে।'

আমি জবাব দেবার আগেই সতীশ বললে—'আচ্ছা, সে আমিই দেখব'খন, মিসেস রীড'—

সমস্ত শীতটা দক্ষিণে কাটিয়ে বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম সেই পুরোনো সহরে। নতুন বাড়িতে দুটো ঘর নিয়ে গুছিয়ে ব'সেই মনে পড়ল মিনুর কথা। দেখতে হচ্ছে একবার—এতদিন বেঁচে আছে কি নেই—যা মনমরা হ'য়ে থাকতে দেখেছি মাস কয়েক আগে।

সতীশ সে বাড়ি থেকে উঠে গেছে আমি দক্ষিণ-দেশে থাকতেই। মিসেস রীডের খুকি পলি এসে দরজা খুলে দিল।

—'মা কোথায় এ্যান? ডেকে দাও তো—'

—'মিষ্টার রায়! আপনি?—আছেন ভালো?'

—'মিনুকে দেখতে এসেছি মিসেস রীড—আছে তো সে?'

—'আছে ব'লে আছে?—আসুন আসুন'—আমাদের ঘরে বসিয়ে, 'এমন চমৎকার বেড়ালকে কি আমি হাতছাড়া করতে পারি? ও-ই যে দেখুন না—ও-ই বাইরে রান্নাঘরের বাগানের দেয়ালে ধ্যানস্থ। কত বড়টি হয়েছে দেখেছেন? আজকাল বাড়িতে ঢুকতেই চায় না—সঙ্গিনী জুটেছে কিনা! মিনু এখন মস্ত লোক, পাড়ার বেড়ালদের সর্দ্দার-গোছের!'

একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখে চলে এলাম।

হায় অপর্ণা, এই তো জগতের ভালোবাসা!—তোমার অভাবের দুঃখ স'য়েও আমাদের প্রাণের ধারা তেমনি টেনে চলেছে আপন স্রোতের জের!

অকারণ?

ষ্টেশনে নেমেই দুখানা ট্যাক্সিতে দুজনে দুদিকে। আগের বন্দোবস্ত মত দাদাকে সাউথ কেনসিংটন ক্লাবে এবং আমাকে বোর্ডিংএ নিয়ে যাবার ভিন্ন ভিন্ন লোক এসেছে। দাদার ইচ্ছে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে নিজের ডেরায় যান, কিন্তু অন্য সহযাত্রীরা বলল তার কোনোই দরকার নেই। এ কলকাতা সহর নয়,—ওরা আমাকে ঠিকই নিয়ে যাবে যথাস্থানে —যথাপর্য্যায়ে।

নটার পরে বোর্ডিঙে পৌছলাম। মেড ওপরে একটি অফিসমত ছোট ঘরে বসিয়ে গেল কর্ত্রীকে খবর দিতে। একটু পরেই পাতলা ছিপছিপে মিস ইয়ং হাজির : 'এই কি মিস গাঙলি? ও মা, এ যে দেখি নেহাৎ ছোট্টটি। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'—অথ নানা সরস সম্ভাষণে বোধ হয় আমার পথশ্রম লাঘবের যথারীতি চেষ্টা।

—'এক গ্লাস গরম দুধ?—না? এখনই শুতে যাবে? আচ্ছা আচ্ছা বেশ, এতটা পথ এসেছ, কিন্তু কিছুই কি খাবে না?'

—'ভাত তরকারি পাওয়া যায় কি?' সকুণ্ঠে শুধোলাম—

—'ভাত তরকারি? না বাছা, সে সেই তিন বছর পরে দেশে ফিরে খেয়ো'খন —এখানে তো ও-সব জুটবে না। বড় মন কেমন করছে তোমার, না? এসো দেখি আমার

সঙ্গে, তোমাদের দেশের আর একটি মেয়ে আছেন এ বাড়ীতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই চলো।'

মিস ইয়ং লোক ভালো, বয়সও বেশি নয়। ভারতীয় মেয়েরা তাঁর এখানে প্রায়ই আসে। কেউ দিনকতক, কেউবা মাস দুই-তিন থেকে অন্যত্র চ'লে যায়। তাঁর ইচ্ছে—লণ্ডনেই যারা পড়বে তারা এখানেই থাকে। সেজন্যে ভারতীয় মেয়েদের সাধারণ বোর্ডারদের চাইতে অনেকটা আরাম ও সুবন্দোবস্তে রাখতে চেষ্টার ক্রটি নেই তাঁর। কিন্তু বেশিদিন বড় কেউ থাকে না এখানে। আমার যার সঙ্গে সে রাত্রে পরিচয় হ'ল, এ-পর্য্যন্ত একমাত্র সে-ই বছরখানেক টিঁকে গেছে। পার্শী মেয়ে, বয়সে আমার অনেক বড়, ভারি সহৃদয়। দাদা বার্মিংহামে চ'লে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম ওরই সঙ্গে যাওয়া-আসা করতাম। মনে মনে স্থির করলাম খর্সেদের সঙ্গে আমিও এখানেই বরাবর থেকে যাব।

মাসখানেক পরে যখন লণ্ডন সহরে একটু কায়েমি হ'য়ে এসেছি—ছুটির দিনে খর্সেদের সঙ্গে এদিক-ওদিক দেখে-শুনে বেড়াচ্ছি, এক রবিবারে ওর এক বান্ধবী—আসামী মেয়ে—এসে প্রস্তাব করলেন Y.M.C.A.-তে 'শেক্ষপীয়র হাট্'-এ যাওয়া যাক, শুধু খাওয়ার জন্যে—Conan Doyle-এর বক্তৃতাও শোনা হবে। উভয় প্রস্তাবেই বিশেষ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম বৈ কি। একে তো এ-বিদেশে ভাত পাওয়া ঘটে শুধু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির গুণে, তার ওপর কোনান ডয়েলকে দেখা—একেবারে জলজ্যান্ত—চোখের সামনে! সেই কোনান ডয়েল যাঁর বই পড়বার সময় কল্পনাও করিনি যে তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে পাব। স্বনামধন্যদের সঙ্গে একেবারে এই মর-জগতে এমনভাবে সাক্ষাৎকার আমার তখনকার অনভিজ্ঞ কল্পনা-বিভোর মনে যে কী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ব'লে মনে হ'ত, ভাবলে এখন হাসি পায়।

শুনলাম শনি রবিবারে এমনিতেই ভারতীয় আহারার্থী আসে লণ্ডনের দশদিশি থেকে। তার ওপর আজকের বিশেষ বন্দোবস্ত : সন্ধ্যা না হ'তেই রেস্তোরাঁয় আর তিল-ধারণের স্থান নেই। আমরা তিনটি মেয়ে মহা অপ্রস্তুতভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি এবং চ'লে যাব, না একটু ধৈর্য্য ধরব স্থির করতে না পেরে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ইতস্তত করছি, এমন সময় সাম্‌নের টেবিলেরই এক ভদ্রমহিলা ইঙ্গিতে আমাদের দেখিয়ে তাঁর পাশের ছেলেটিকে জনান্তিকে কি বললেন। সে অমনি উঠে খর্সেদের কাছে এসে বললে—'আপনারা এই টেবিলে বসুন,—আমি আরো দুখানা চেয়ার এনে দিচ্ছি এক্ষুনি। আজ বড় ভিড় কিনা, কিছু মনে করবেন না, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে আপনাদের।'

পরে 'হলে'ও আমাদের সেই মহিলাটির সঙ্গে সুমুখের দিকে বসতে দেওয়া হ'ল। কোনান ডয়েল সেদিন ঠিক কি নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই। কিন্তু এটি বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে, বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ইউনিয়নের এবং বাইরের অভ্যাগত ছেলেরা তাঁকে ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব নানান প্রশ্ন ক'রে এবং 'সাদাকালো' নিয়ে কি-একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলার জন্যে শেষের দিকে দারুণ উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। মেঝে পা ঘষা, শিষ দেওয়া, অযথা কাশি এইসবে এমন গোলমালের সৃষ্টি হ'ল যে এর পরে আর সভা জমতে পারে না। ডয়েল চ'লে যাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিকে পারল উঠে পড়ল।

খর্সেদ আমার হাত ধ'রে একটু নিরালায় টেনে এনে বললে—'যূথিকা, মিনিট কয়েক অপেক্ষা করো, আমি একবার ঐ বন্ধুটির সঙ্গে দুটো কথা ব'লে আসি।' আসামী মেয়েটির ভাই এখানেই থাকতেন—তাঁরাও কি প্রয়োজনে উপরে গিয়েছেন। আমি একা অপেক্ষা করছি, এমন সময় পূর্ব্ব-দৃষ্টা সেই মহিলা এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে শুধোলেন —'তোমার সঙ্গিনী?' আমি বললাম—'ওদিকে গেছে—এক্ষুনি আসবে।'

—'ওঃ, তুমি বুঝি নতুন এসেছ? এখানে কোথায় থাকো? আত্মীয়-স্বজন?'

আমি যথাযথ উত্তর দিলাম।

—'পড়তে এসেছ নিশ্চয়?—কী পড়ো?'

এবার একটু আশ্চর্য্য লাগল। ইংরেজরা তো 'গায়ে-প'ড়ে' আলাপ করে না ব'লেই শুনেছি। ইনি যেন আমাদের দেশেরই একজন। মনে পড়ে, ছুটি ফুরুলে কলকাতায় যাবার পথে ষ্টীমারে ই'ন্টারে যে কয়জন মহিলা থাকতেন—বৃদ্ধা থেকে যুবতী পর্য্যন্ত —সবাই বড়জোর মিনিট-দুই নীরবে আমাদের দেখে নিয়ে, সেই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যেতেন—'কি করো বাছা? যাবে কোথা? এত বয়েস পর্য্যন্ত বাপ-মা বিয়ে না দিয়ে রয়েছে কেমন ক'রে গো—তোমরা কি কলকাতার স্কুলের মাষ্টারণী নাকি?'—সমাপ্তিহীন জিজ্ঞাসাবাদ থামত শুধু তখন, যখন আমরা স্থানাভাব সত্ত্বেও বাইরে থার্ডক্লাসে ডেক্-এ এসে দাঁড়াতে বাধ্য হতাম, এম্‌নি এক-আধবার নয়। ওঁদের না আছে এতটুকু সংকোচ, না জিজ্ঞাসিতের বিরক্তির ভয়। ঘণ্টা-কয়েকের জলযাত্রা বা ট্রেণযাত্রার পরেই যে-যার পথে চলে যাবে, এ-জীবনে কারোর সঙ্গে কারোর আর দেখাই হবে না, এত-শত মনে রাখে কে?—এত অন্তরঙ্গ হ'য়ে এমনসব ঘরের ও ভিতরের কথা জানতে আগ্রহ দেখানো —যেন ওই জানাটুকুর উপরে তাঁদের কত-কী-ই নির্ভর করছে। উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ব'সে দেখেছি—তাতেও রাগ : অহংকারী মনে করেন। উত্তর দিলে আরো মুস্কিল —কত যে অযাচিত উপদেশ শুনতে হয়, সেসব এখানে ন' বলাই ভালো।

আমাকে নীরব দেখে মহিলাটি একটু হেসে বললেন—'কিছু মনে কোরো না মা, আমার একটু বাচাল স্বভাব—তা ছাড়া সেকেলে বুড়োমানুষ, দেখছ তো—তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অত আদব-কায়দা মেনে চলতে পারি না।' আমি বড় লজ্জা পেলাম : খর্সেদ ও তার বন্ধু ফিরে আসতে আসতে বৃদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ বেশ সহজ হ'য়ে এল। সেক্রেটারি এতক্ষণ ওদিকে ব্যস্ত ছিলেন, এবার কাছে এসে বললেন —'মিস টমাস, আপনাকে টিউব ষ্টেশনে পৌঁছে দেব?'

—'ধন্যবাদ মিঃ পাল, আমি একাই যেতে পারব। এতক্ষণ চ'লেও যেতাম, কেবল ভিড় কমবার আশায় এদিকে একটু দাঁড়াতে এসে এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপে কখন যে সময় কেটে গেল!'

সেক্রেটারির কাছে আমরা মিস টমাসের পরিচয় পেলাম—ইউনিয়নের অনেকদিনের মেম্বর, প্রায়ই না কি এখানে আসেন। ভারতীয় ছেলেমেয়েরা ওঁকে খুব ভালোবাসে, তিনিও ওদের জন্যে যথাসাধ্য করেন। এর পরে আরো কয়েকবার এখানে এসেছি এবং

প্রায় প্রতিবারেই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। এমন মিষ্ট স্বচ্ছ স্নেহশীল স্বভাবের মানুষ আমি কমই দেখেছি। অল্পদিনেই আমরা পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লাম।

একদিন কথায় কথায় বললাম—'আমি শীঘ্রই বোর্ডিং থেকে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছি। খর্সেদের ভিয়েনায় পড়তে যাওয়া ঠিক—আমি আর একলা বোর্ডিঙে থাকতে চাই না।' মিস টমাস জিজ্ঞাসা করলেন—'কিন্তু কোথায় যাবে, তা ঠিক করেছ কি? হাজার হোক এটা চেনা জায়গা এবং নিরাপদে আছ,—নতুন জায়গায় অসুবিধা হবে না?'

—'আমি এবার কোনো ইংরেজ পরিবারে গিয়ে থাকতে চাই ; বাবারও তাই ইচ্ছে। আপনার জানা-শোনা সে-রকম কেউ আছেন কি?'

মিস টমাস একটু ভেবে বললেন—'ঠিক সে-রকম আর আছে বলি কী ক'রে? তোমরা ভদ্রঘরের মেয়ে, যে-সে বাড়ীতে তো আর পাঠানো যায় না মা। আবার এদিকে এদেরও বর্ণবিদ্বেষ যথেষ্ট—সহজে কি ঘরে নিতে বিদেশীকে চায়? নেহাৎ দারিদ্র্যের জন্যে বা সে-রকম কোনো দায়ে ঠেকেই পেয়িং গেস্ট্ রাখে।' শুনে ভারি হতাশ হলাম।

মিস টমাসকে ও-কথা বলবার দিন পাঁচ-ছয় পরে টেলিফোনে আমার তলব পড়ল। টেলিফোনে তিনিই আমাকে ডাকছেন—সাম্‌নের শনিবার অবশ্য তাঁর ওখানে চা-এ যেতে।

হ্যাম্পস্টেডে তাঁর বাড়ি। চা-পানান্তে নির্জ্জন ড্রইংরুমটিতে এসে আগুনে আরো কয়েক টুকরো শুকনো কাঠ ফেলে দিয়ে আমাকে ডেকে তিনি সোফায় নিজের পাশে বসালেন এবং অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর বললেন—'যূথি, তুমি যদি ইচ্ছা করো আমার এখানেই থাকতে পারো।' আমি এতটা আশা করিনি, খুসি হ'য়ে বললাম—'এ যে আশাতীত সৌভাগ্য মিস টমাস, আপনি আমার উপর বড় সদয়।'

—'না যূথি, হঠাৎ কিছু ঠিক ক'রে ফেলো না। আগে সব শোনো। আমার এখানে লোকজন বেশি নেই—দেখতেই পাচ্ছ। থাকবার মধ্যে আমি আর আমার ছোটি বোন। মেড সকালে আসে,—শুখো—সন্ধ্যায় চলে যায়, মালীর বাড়ীও কাছেই। তুমি ছেলেমানুষ, এত নির্জ্জনতা হয়ত ভালো লাগবে না—আমি বেশির ভাগ সময়ই বাইরে থাকি কি না।' একটু থেমে, আমি কিছু বলবার আগেই—'শুধু এ-ই নয়। আসল কথা যে-জন্য বাড়িতে লোকজন রাখতে পারি না, এমন-কী চাকরাণিও নয়—কেউ থাকতেও চায় না, দুদিনেই চ'লে যায়'—ব'লে আগুনটা উস্কিয়ে দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

—'সব খুলেই বলি তোমাকে'—ব'লেই হঠাৎ আবার কি ভাবতে লাগলেন।

আমি শুধু উৎসুকনেত্রে চেয়ে রইলাম—মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি : কী এমন কথা থাকতে পারে যা বলতে মিস টমাসের এত সংকোচ বোধ হচ্ছে—স্নেহমণ্ডিত সদাহাসি মুখখানি এমন বিষণ্ন দেখায়! বড় কৌতূহল হ'তে লাগল। তবু তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে বললাম—'আমাকে না বললেই নয় কি?'

—'না যূথি, বলাই ভালো। আমার বাড়ীতে থাকাই যদি ঠিক হয়, আমার ইচ্ছে তুমি সব জেনে-শুনে তবে এসো। কথাটি এই—আমার বোন—সুস্থ নয়। ঠিক পাগলও বলা চলে না—অথচ, অর্থাৎ—সহজ অবস্থাও নয়। বেশি কি আর বলব মা, তুমি স্বচক্ষেই

সব দেখবে। কেবল এই অনুরোধ, সে যদি কখনো অভদ্রতা করে বা কোনো কঠি
কথা বলে, তাকে ক্ষমা কোরো—এর বেশি উপদ্রব সে আজকাল বড়-একটা করে
না।'

—'ও, এই! এ আর বেশি কথা কি? আমার ওরকম লোক দেখা অভ্যেস আছে
একটি আত্মীয় ছেলেবেলা হ'তে আধ-পাগল—'

—'এ ঠিক সে-রকম নয়, যূথি। তবু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। আমি—কেন জানি
না, তোমার প্রতি ভারি একটা আকর্ষণ অনুভব করি, তাই এই বাধা সত্ত্বেও তোমাকে
এখানে থাকতে বলছি—জানি না ভালো করছি কি না। তোমাকে দেখে মনে হয়—নিতান্ত
অনভিজ্ঞ...অপরিচিত লোকের বাড়িতে পাঠাতে ভয় করে—নিঃসন্তান নারীর আসক্তি
বুঝে ক্ষমা কোরো মা।'

—'ছি, ছি, মিস টমাস, আপনি এসব কি বলছেন বলুন দেখি? আপনার মত এমন
স্নেহময়ীর আশ্রয় পাব, এ কি আমি কখনো কল্পনাও করেছিলাম? বাড়ীতে লিখে দিলে
কত খুসি হবেন সবাই—দাদাকেও আমি কালকেই জানাচ্ছি সব।—আর, আপনার বোনের
কথা—দেশে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমাদের কতরকম লোকের সঙ্গে কত যে
গোলমালের ভিতর থাকতে হয়, সে আপনি জানেন না ব'লেই অত ভাবছেন। সাংসারিক
অভিজ্ঞতা আমার কম তো বটেই,—সেজন্যেও আপনার বাড়ীতে স্থান পেলে নিশ্চিন্ত
হব।'

—'বেশ মা, তবে তা-ই থেকে দেখ দিনকতক। কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই, ভালো
না লাগলেই চ'লে যেতে পারবে।'

সপ্তাহান্তে নতুন বাড়ীতে উঠে এলাম। মিস টমাসের কটেজটি বড় সুন্দর, ট্রাম
লাইনের থেকে দূরে—একেবারে 'হীথে'র (Hampsted Heath) কাছেই। সে পল্লীতে
সবই প্রায় একই ধরণের বাড়ী—সাম্‌নে পিছনে বাগান। যেমন নির্জ্জন তেমনি মনোরম।
সহরের গণ্ডগোল থেকে এসে মনটা স্নিগ্ধ শান্তিতে ভ'রে যায়। এখান থেকে কলেজে
যাতায়াতে কিছু বেশি সময় লাগলেও, অপর সব রকমে এত সুবিধে যে, আমি মিস
টমাসের কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলাম। এই বিদেশিনী মহিলার মায়ের মত
সদাসজাগ স্নেহে পরের বাড়ী দুদিনেই আমার আপন গৃহতুল্য প্রিয় হ'য়ে উঠল।

আশ্চর্য্য এই যে, যাঁর ভয়ে এ-বাড়ীতে লোকজন থাকে না, আমি এসে কিছুদিন
তাঁর কোনো উদ্দেশই পেলাম না। মিস টমাসকে জিজ্ঞাসা করতে বাধে, কারণ এ-বিষয়ে
তাঁর সংকোচ কত, তা প্রথম দিনই সেই প্রসঙ্গে বুঝেছি। তার পরে তাঁর নীরবতা থেকেও।
চাকর-বাকরকে প্রশ্ন করা তো চলেই না।

যাহোক্, ক্রমে আমার ভয় কেটে গেল। মাঝে মাঝে কৌতূহল হ'ত, তা-ও প্রায়
নিভন্ত।

এমন সময় একদিন খুব ভোরেই উঠতে হ'ল। ডাইনে স্নানের ঘরের দিকে
যেতে দেখি, কে একজন পাশ কাটিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ভয় পেলাম একটু : 'কে
ওখানে?'

কোনো উত্তর নেই। সেখানে তখনও রীতিমত অন্ধকার—ফিরে সিঁড়ির কাছে গিয়ে

আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। দেখি—মিস টমাসেরই যেন একখানি দ্বিতীয় সংস্করণ। আমার মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে হঠাৎ কেমন-যেন হেসে বললেন—'গুড্ মর্ণিং!'

—'গুড্ মর্ণিং' ব'লে আমি ফিরবার উপক্রম করতেই খুব কাছে এসে বললেন—'তোমার নাম কি, মেয়ে?'

বললাম। তারপর সেই যে প্রশ্ন-বর্ষণ সুরু হ'ল—একটার পর একটা—সে আর থামেই না। অবশেষে কাতর হ'য়ে ভাবলাম, ইনি বোধ হয় আমাকে যেতেই দেবেন না—অথচ...চ'লে গেলেও যদি রাগ করেন! ঠিক কী ধরণের ব্যবহার করলে বা কী বললে যে খুসি হবেন তাও তো ঠাউরে পাওয়া দায়! ভয়ে ভয়ে তাই কেবল যথাসম্ভব সত্য উত্তরই দিতে লাগলাম। কিন্তু ওঁর আর নড়বার নাম নেই—পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে এক একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন আর মুখের দিকে তাকিয়ে অসংকোচে হাসেন। হঠাৎ বললেন—'কে বললে তুমি বাঙালি? মিছে কথা, তুমি জাপান থেকে এসেছ—জাপানী মেয়ে!'

—'না মিস, সত্যি কথাই বলেছি...'

—'সত্যি কথা? কক্ষনো না—আমি বলছি তোমাকে—তুমি জাপ, নিশ্চয় জাপানী মেয়ে—'

ভালো বিপদেই পড়া গেছে! কুড়ি বছর পরে আজ হঠাৎ এক কথায় প্রমাণ হ'য়ে গেল নিজেকে যা বলে জানতুম তা আগাগোড়া ভুল! কী করি এখন এঁকে নিয়ে? উদ্ধারের কোনো পথ আছে কি না ভাবছি, এমন সময় মিস টমাস পাশেরই শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'রিণা, মেয়েটিকে যেতে দাও,—ওর ক্লাস আছে আজ খুব সকালেই।'

—'ওঃ ডোরা, ডোরা, দেখ কী আশ্চর্য্য—একেবারে জাপানী মেয়ে, তেম্‌নি চোখের কোণ, তেম্‌নি ভুরু—হাসলে অবিকল জাপ। এ নীল গাউনটাও তো জাপানী।—তবু বলবে তুমি বাঙালী?'

কী গ্রহবৈগুণ্যে জানি না—ঠিক সেইদিনই একটা 'কিমোনো' প'রে উঠেছিলাম। মিস টমাস চোখ টিপে আমায় ইসারা করলেন। হেসে বললাম, 'বেশ তো মিস টমাস, আমি জাপানী হ'লেই যদি আপনি খুসি হন, না হয় আমি তা-ই।'

—'তাই-ই তো—আমাকে ফাঁকি দিতে পারো কখনো? মানুষ চিনি না আমি? কিন্তু কী নাম বললে তোমার—নাঃ, ও-তো ঠিক নাম নয়—ডোরা, এর নাম বেবি—হ্যাঁ—বেবি-ই তো, নিশ্চয়ই বেবি।'

—'আচ্ছা, তুমি ওকে না হয় 'বেবি' ব'লেই ডেকো, রিণি। লক্ষ্মী বোন, এখন ওকে যেতে দাও, আছেই তো বাড়িতে, কত দেখবে রোজই।' মিস টমাস সস্নেহে বোনের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন।

এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ। তারপর থেকে রিণাকে যখন-তখন দেখি। বাড়ির একেবারে উপরের তলায়—চিলেকোঠার মতন একটা ছোট্ট ঘরে থাকেন তিনি। সেখানে কারো যাবার উপায় নেই, লোকজনের ছায়াও তিনি মাড়াতে পারেন না যে। খুব ভোরে উঠে দোতলায় নিজের বিশেষ দরকারি কাজগুলো সেরে এক পেয়ালা কফি হাতে সেই যে উপরে চ'লে যান, তারপর সেখানেই সারাদিন থাকেন—সেখানেই খাওয়া

তো পাও। তোমার ওপর অত্যাচার যে লক্ষ্য করিনি তা-ও নয়। কেবল—ভেবেছিলাম —খুব বেশি যদি বিরক্ত না করে তোমায়, তবে ক'দিন এতে একটু আনন্দ পায় তো—', ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি চুপ করলেন।

আমার হঠাৎ কি মনে হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা, রিণা কি চিরকালই এই-রকম? জন্ম থেকেই?'

মিস টমাস একটু চমকে উঠে উত্তর করলেন—'সেই কথাই আজ তোমাকে বলব কি না ভাবছি। বললে হয়ত অনেক কিছুই বুঝতে পারবে। কিন্তু শুনতে চাও কি না সে-সব—'

—'বলুন না, অবশ্য যদি বলতে আপনার খুব কষ্ট না হয়—'

—'কষ্ট যা হবার তা হ'য়েই গেছে, মা।—কিন্তু একটু অপেক্ষা করো, আমি রিণাকে ব'লে আসি তুমি শুয়ে পড়েছ আমার ঘরে—নইলে আবার গোলমাল করতে আসবে।' মিস টমাস উঠে গেলেন। আমি শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম, না জানি কি রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে ও-ই অভাগিনী নারীর জীবনে!

একটু পরেই তিনি ফিরে এসে একখানা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে আমার খুব কাছে বসলেন এবং ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—'তুমি আমার মেয়ের মত। সময়ের মাপে পরিচয় আমাদের বেশিদিনের নয়; কিন্তু অন্তরের পরিচয়ে আমরা পরস্পরের অত্যন্ত নিকট, অতি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গিয়েছি, নয় কি যূথি?' আমি নীরবে তাঁর হাতখানি কোলে টেনে নিলাম।—

মিস টমাস বললেন—'সেজন্যেই আজ তোমার কাছে এ কথা বলতে পারছি। যদিও জানি সংসারের সঙ্গে তোমার এখনও সত্যিকার কোনো পরিচয়ই হয়নি, তবু অপরের জীবনের জটিলতাকে কোনো দরদী প্রাণই খুব কঠোরভাবে বিচার করে না,—জীবন-যুদ্ধে শতবার ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও এ বিশ্বাস আমার আজও অটুট আছে। যাক—প্রথমেই শোনো, আমরা পুরো ইংরেজ নই। আমার বাবা ছিলেন ইংরেজ, মা—সুইস্ মেয়ে—'

আমি ব'লে উঠ্লাম—'ও, তাই—'

—'কী তাই?'

—'বলতে গিয়েছিলাম, তাই আপনার স্বভাব ঠিক ইংরেজদের মতন নয়—এই আর কি।'

—'তার মানে?'

—'ইংরেজরা সাধারণত একটু চাপা নয় কি? সহজে, বা যাকে বলে "গায়ে-প'ড়ে", কারো সঙ্গে আলাপ অথবা বন্ধুতা করতে পারে না—অন্তত আমি তো দেখিনি আজ অবধি। বিশেষত ভারতীয়দের সঙ্গে ওদের এত শীগ্‌গির এতখানি ঘনিষ্ঠতা হয় না। তাছাড়া আরও দু-একটি কারণ আছে, সেসব আপনাকে এখন না-ই বা বললুম—আপনি কি বলছিলেন বলুন তার চেয়ে।'

তিনি হেসে বললেন—'আচ্ছা, তোমার অন্য কারণগুলো আর একদিন শুনব —কি বলছিলাম—হাঁ, আমার মা ছিলেন সুইস্ মেয়ে। এ দেশে বেড়াতে এসেছিলেন কিছুদিন কোনো ইংরেজ-পরিবারে থেকে ইংরিজি ভাষাটি ভালোমতে আয়ত্ত ক'রে

স্বদেশে ফিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইংরিজি শেখাবেন, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। আমার দাদামশায়ের অবস্থা মন্দ ছিল না। মেয়ের এই খেয়াল ওঁর ভালো লাগেনি, তবু বাধাও তিনি দেননি। যাক সেসব কথা, পারিবারিক ইতিহাস দীর্ঘ ক'রে তোমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলব না। সংক্ষেপে—মা-র রোমান্সের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হয় এ দেশেই। তিনি ছিলেন ভারি সুন্দরী। আমার পিতৃ-বংশ নামজাদা অভিজাত, অতি গর্ব্বী লোক। ঠাকুরদা কিছুতেই এ বিয়েতে মত দিলেন না—হাজার সুন্দরী হোক, কৃষকের মেয়ে, এই ছিল তাঁর আপত্তির মূল কারণ। কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে কৃষাণ মেয়েকে অভিজাত-কূলতিলকের চোখের আড়ালে রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। কিন্তু—নিয়তি ; বাবা লুকিয়ে বিয়ে করলেন মাকে।'

মিস টমাস মৃদু সুরে ব'লে চললেন : 'এত অমত সত্ত্বেও বিয়ে করায়, যতদিন বাবা বেঁচেছিলেন, ঠাকুরদা আর কখনো তাঁর নামও নেননি। তাঁরই ছেলে—chip of the old block তো—বাবাও বাড়ীর লোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন : পৈতৃক নামটি পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মার কাছে শুনেছি বিয়ের পরে তাঁদের বড় কষ্টে দিন গুজরান হ'ত। কিছুদিন পরেই সামান্য অসুখে বাবা হঠাৎ মারা যান। অনুতপ্ত ঠাকুরদা মাকে তখন থেকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু শত অনুরোধেও মাকে রাজি করানো গেল না। আমার ঠাকুরদার নাম বললে চিনতেও পারো, তাঁর অনেক দান-ধ্যান আছে।

'আমরা ভাই-বোনে তিনটি, আমিই বড় ; মাঝের ভাইটি টাইফয়েডে শৈশবেই মারা যায়। ফলে, আইরিণ হ'য়ে উঠল মার নয়নের মণি। ছেলেবেলায় সে যে কী সুন্দর ছিল এখন আর বুঝবার জো নেই—'

—'কেন, এখনই কম কি? এই তো অবস্থা, বয়সও এত—তবু—'

—'হ্যাঁ—কিন্তু তখনকার চেহারার সঙ্গে কি কোনো তুলনা হয় ওর?—সুগন্ধী রেশমের মত নরম চুলের রাশ, মখমলের মত ত্বক, গোলাপের পাপড়ির মত পাতলা রাঙা ঠোঁট দুখানি, লীলায়িত তনু দেহখানি—সবার ওপর ওর চোখদুটি, সে যে কী ছিল যূথি, তোমায় কী ক'রে বোঝাব বলো? ওর সেই অদ্ভুত শান্ত কোমল চাহনি আজও ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে কখনো কখনো—ওর চোখদুটির দিকে চেয়ে। সেই আইরিণ—আর এই? সকালবেলার স্বচ্ছ স্বয়ং-সোনালি আকাশ—আর কালো জলে তার ছায়া?' মিস টমাস চোখ মুছলেন। —'কিছু মনে কোরো না, মা। এখন স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকা ছাড়া আর কী বলো? এখনও সে-সব দিনের কথা মনে হ'লে—', একটু থেমে আত্মসংবরণ ক'রে—'যাক্ আইরিণের চোখের উল্লেখে একটি কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলা থেকে ও-ধরণের অকারণ বিষাদ-কোমল দৃষ্টি যাদের, প্রায়ই দেখেছি পরবর্ত্তী জীবনে তারা কোনো-না-কোনো সূত্রে বিশেষ আঘাত পায়, যা তাদের চির-দুঃখের হেতু হয়। যেন ওরা জন্ম থেকেই জেনে এসেছে—এ-সংসারে ওদের ব্যথা পাওয়াই হবে সার এবং সেই জ্ঞানের অঞ্জনেই যেন চোখদুটি তাদের নিত্য এত করুণ—ছায়াময়! এম্‌নি চোখ ছিল আমার আইরিণের, আর আবার বলছি, কিছু মনে কোরো না, মা—প্রথম সাক্ষাতে তোমারও চোখে এই ধরণের একটা বিষণ্ণ-কোমল ভাব দেখেই আমি অত আকৃষ্ট হই।'

—'তাই নাকি?'—আমি একটু হেসে ওঁর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলাম।

মিস টমাস বললেন : 'যাক, যা বলছিলাম—কী বলছিলাম যেন!—ও হ্যাঁ—আইরিণ আমার একমাত্র বোন, তাকে একরকম কোলেপিঠে ক'রেই মানুষ করেছি। বাবার মৃত্যুর পর মা'র মন একেবারে ভেঙে পড়ে। এ সময় ঠাকুরদা নানা কৌশলে অর্থসাহায্য না করলে হয়ত দারিদ্র্যে ও মনঃকষ্টে অচিরেই আমরা মাকেও হারাতাম। আজীবনের যে সচ্ছলতা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে জীবিকা-উপার্জ্জন-অনভ্যস্ত পিতা দুঃখে চিন্তায় উৎকণ্ঠায় অকালেই মারা যান, মা'র আমার কেমন জেদ হ'ল—সেই ধনসম্পদের এক কানাকড়িও নেবেন না। সন্তানদুটির জন্যে অপ্রত্যাশিত বৈধব্যের প্রথম অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে কিছু নিলেও তা যেন দিনরাত তাঁকে শেল হ'য়ে বাজছিল। একটু সুস্থির হ'য়েই সব সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনি আপন ভার আপনিই নেবেন বললেন। কিন্তু নিঃসম্বল অনাথা, তার উপর শারীরিক শ্রম সয় না বেশি। কে তাঁকে চাকরি দেবে?

'অবশেষে—অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি ভদ্রপরিবারে ছোট শিশুদের দেখাশোনার কাজ পাওয়া গেল। তাতেও তিনজনের বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট অর্থাগম না হওয়ায় আমাদের বাড়ীর সবচেয়ে ভালো দুটি ঘর ভাড়া দিতে বাধ্য হলেন। এর পরে কিন্তু আর ঠাকুরদা আমাদের মুখ দেখলেন না। তাঁর অন্য পুত্রসন্তান কিম্বা আমাদেরও কোনো ভাই না থাকায় পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল তাঁরই কোন্ এক দৌহিত্র।

'দিনের বেলায় মা কাজে চ'লে যেতেন—আইরিণকে দেখাশুনা ও বাড়ী আগ্‌লাবার ভার আমার ওপর দিয়ে। ভাড়াটেরা শুধু দুটি ঘর নিয়ে থাকত, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজের হাতেই। এমনি সুখে-দুঃখে অনেক দিন কেটে গেল : আইরিণ হ'য়ে উঠল ১৬/১৭ বছরের তন্বী মেয়ে। আমি তার বছর ছয়েকের বড়—প্রতিদিন ঘণ্টা হিসাবে এক রুগ্না মহিলার সহচরী ও প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করি। আইরিণ প্রায়ই একলাই বাড়ীতে থাকে।

'একদিন কি একটা কাজে কাছেই দোকানে যাবার জন্যে ফটক খুলে বাইরে আসতে দেখি একটি যুবক দরজার পিতলফলকের উপর আমাদের নাম পড়বার চেষ্টা করছে। আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতেই বললে—"মিসেস টমাসের—?"

'বললাম, "এই বাড়ীই। কি দরকার, আপনি কাকে চান?"

—"আমি তাঁর আত্মীয়, বিশেষ কাজ আছে।"

—"মা বাড়ী নেই, সন্ধ্যার আগে আসবেন না—আমাকে বলতে যদি আপত্তি না থাকে—"

—"ও, আপনি তাঁর বড় মেয়ে?"

—"হ্যাঁ।"

'পরিচয় পেলাম—ছেলেটি জন রবার্ট, আমাদের পিসতুতো ভাই, যে এখন ঠাকুরদার ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। বাড়ীতে ওকে সবাই "জন" ব'লে ডাকে। এমনি আলাপ-পরিচয়ের পর বললে—"কিন্তু কাজের কথা তো আপনার মার সঙ্গে ছাড়া হ'তে

পারবে না। আমি না হয় সন্ধ্যার পরে আবার আসব।"

'রাত্রে মার সঙ্গে জনের দেখা হ'ল। ঠাকুরদাই পাঠিয়েছেন। মার জীবিকা-অর্জ্জনের ধারায় তিনি মর্ম্মাহত। বর্ত্তমানে কঠিন রোগে শয্যাগত, দিন ফুরিয়ে এসেছে। জীবনে যে মস্ত ভুল করেছেন তার অন্তত খানিকটাও শোধরাবার অবসর কি তাঁকে দেওয়া উচিত নয়? মা না হয় তাঁর বংশমর্য্যাদার কথাটা না-ই ভাবলেন, কিন্তু তিনি কি তাঁর পৌত্রীদুটিরও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার অধিকারী নন? ইত্যাদি। বয়সের গুণে মার ক্লান্তিও এসেছিল। ঠাকুরদার খেদের কথাগুলো মনে লাগল। তাছাড়া শোকের আঘাতে যে প্রচণ্ড অভিমান এসেছিল, সময়ের প্রলেপে শোক কমবার সঙ্গে সঙ্গে সে জেদ অভিমানও হয়ত একটু ফিকে হ'য়ে এসেছে। তিনি রাজি হলেন। ঠাকুরদা তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির যে কতকাংশে দানবিক্রয়ের অধিকার ছিল, তারই কিছু এবং দুখানা বাড়ী আমাদের দু বোনকে সমানে ভাগ ক'রে দিলেন। একখানা বাড়ী এই, আর একখানা ভাড়া দেওয়া। তাছাড়া, গ্রামেও এক বড় বাড়ী ও কিছু জমিজমা আছে—সেখানা ফার্মহাউস ক'রে দীর্ঘদিনের চুক্তিতে ভাড়া দিই।

'ঠাকুরদা মাকে বললেন শেষ কদিন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে থাকি। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর যে-যার জায়গায় যাবে চ'লে। মৃত্যুর আর দেরিও ছিল না বড়।

'মা বাড়ীওয়ালাকে নোটিস দিলেন। আমাদের ভাড়াটেকেও অন্যত্র বাড়ী দেখতে বলা হ'ল।

'পুরোনো বাড়ী ছাড়বার দিনকতক আগে আইরিণের হঠাৎ বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। ওর সেই বালিকা-সুলভ হাসিখুসি ভাব, সেই কথায় কথায় আদরে-আবদারে গ'লে-পড়া, যখন-তখন মাকে বোনকে অনর্গল যা তা ব'লে হাসানো—কোথায় যেন সব গেছে উবে। সে বিষণ্নমুখে কেমন অদ্ভুত ধীরভাবে চলাফেরা করে, আমাদের কাছে বড়-একটা আসে না—যতটা সম্ভব একা একাই থাকে। আমরা তখন বড় ব্যস্ত ছিলাম, ওর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেও দুজনেই মনে করলাম এ শুধু পুরোনো বাড়ীর উপর মমতা আর তার জন্যে মন-কেমন-করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

'ভাড়াটে উঠে যাবার পর একদিন সন্ধ্যায় একটু কি দরকারে সেদিককার শোবার ঘরখানিতে ঢুকে দেখি, সে-ঘরের আবছা আঁধারে টেবিলের উপর মুখটি গুঁজে আইরিণ একা ব'সে। দেখে বড় আশ্চর্য্য লাগল—এ সদাচঞ্চল হরিণ-শিশুর এমন কী ভাবনা, এ-বাড়ীর উপরও তার এত কিসের টান যে এমন সময়ে একলা ব'সে চিন্তায় যেন একেবারে ডুবে গেছে? কাছে গিয়ে ডাকলাম—"রিণি!"

'আইরিণ ভীষণ চমকে উঠে একেবারে যেন শতধা ভেঙে পড়ল। আমার মনটা অজানা ভয়ে অসাড় হ'য়ে গেল। একটু পরে দরজাটা বন্ধ ক'রে খুব কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম—"কি হয়েছে বোন?"

'অনেক জিজ্ঞাসাবাদ, অনেক আদর আর অভয় দেওয়ার পর সে যা বলল—আঃ যূথি, আজও সেদিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে,—সে-ব্যথা, সে-সব অপমানের আগুন আজও এ-বুকে তেমনি যেন জ্বলছে—', বৃদ্ধার ঠোঁটদুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠে শীর্ণ কপোল বেয়ে দুটি শীর্ণ ধারা নামল।

আমি দুঃখিত হ'য়ে বললাম—'আর দরকার নেই এ-সব ব'লে—'

—'ক্ষমা করো, যূথি—কিন্তু ওঃ ভগবান, স্মৃতিতেও এখনো এত জ্বালা! মনে হয় যেন সেদিনে ফিরে গিয়েছি,—যেন এই আজই ঘটেছে ব্যাপারটা!' একটু স্থির হ'য়ে আবার বলতে লাগলেন—'তোমার কাছে ব্যথার বোঝা নামাচ্ছি, স্বার্থপর জরাজীর্ণার দুঃখের কাহিনী ধৈর্য্য ধ'রে শুনছ, এই-ই বা আমি কোথায় কার কাছে পেয়েছি? যাক, শোনো—সংক্ষেপেই—আমাদের শেষ ভাড়াটে ছিল এক—এক জাপানী যুবক। তখনকার দিনে বিদেশী ভাড়াটে নেওয়া একটু দুঃসাহসের কথা ছিল। কিন্তু এই ছেলেটি সম্ভ্রান্তবংশীয়, ছাত্র, ভারি সহৃদয়—মা ওকে বিশেষ জেনেশুনেই ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। কি পড়ছিল জিজ্ঞাসা করিনি, সে-ও নিজে থেকে কখনো বলেনি। শুধু এইটুকু জানতাম যে, মাঝে মাঝে সে ইংলণ্ডের নানা জায়গায় ঘুরে কলকারখানা, শিল্পবিদ্যা, শিক্ষাকেন্দ্র এইসব দেখে বেড়াত। ওর সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। নিজের ঘরে আপন ভাবে থাকত, আমরা কখনও ওর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতাম না—কিন্তু কবে থেকে যে আইরিণের ওকে এত—', মিস টমাস জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন—'ঐটুকু মেয়েও যে ভালোবাসতে পারে এবং এতই গভীরভাবে—সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? তখনকার দিনকাল, যূথি, অন্যরকম ছিল। এখন আমাদের মেয়েরা অতিমাত্রায় অকালপক্ক।—কিন্তু এ-ই কি সব?—তাহ'লে আর কাঁদি কেন?—সেই শিশু-স্বভাব আইরিণ—যে তখনও স্কুলের মেয়েদের মত বেণী ঝুলিয়ে বেড়াত—'

আমি সস্নেহে তাঁর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললাম—'আজ এ পর্য্যন্ত থাকুক, বাকিটা আর একদিন শুনব—'

—'আর বড় বেশি নেইও—মাকে সব বলবার পর তিনি কি-একরকম হ'য়ে গেলেন। বললেন—তাঁর দোষেই এতটা হ'তে পেরেছে। তিনি যদি ছেলেটিকে মাঝে মাঝে চা-এ না ডাকতেন, আইরিণের তো ওকে এত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগই হ'ত না। তিনি না-কি কতবার লক্ষ্য করেছেন যে, ও এলেই আইরিণের মুখচোখ উঠত উজ্জ্বল হ'য়ে। ছেলেটিও ওকে যথেষ্ট যত্ন করত, প্রায়ই নানারকম জাপানী জিনিষ উপহার দিত, বলত জাপানের গল্প। জানো তো—ওরা কি রকম ভদ্র—সুন্দরের প্রতি প্রীতি ওদের মজ্জায়! আইরিণের ওকে ভালো লাগায় আশ্চর্য্য হইনি, কিন্তু সে-ভালো-লাগায় যে কোনো বিশেষত্ব থাকতে পারে—একবারও মনে হয়নি।' মিস টমাস অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

একটু পরে সচেতন হ'য়ে বললেন, 'মা কিছুতেই আর ঠাকুরদার বাড়ী যেতে চাইলেন না : শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে আইরিণকে নিয়ে চ'লে গেলেন সুদূর ইটালিতে। আমি ঠাকুরদার কাছে রইলাম ; তিনি দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে, মা বাবার মৃত্যু ক্ষমা করতে পারেননি ব'লেই ও-বাড়ী গেলেন না।

'প্রায় বছরখানেক ওরা ইটালিতে ছিল। সেখান থেকে খুব সাধারণ কথাবার্ত্তা ছাড়া চিঠিতে মা আর কিছুই লিখতেন না। ইতিমধ্যে আমার জীবনেও কত স্রোতই যে এল গেল—! জন আমাকে বিয়ে করতে চাইলে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঠাকুরদা মত দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি জনকে বললাম মা-র ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে। ভেবেছিলাম,

চিরদুঃখিনী জননীকে অন্তত এই একটুখানি সুখ দিতে পারব। তখন কি জানতাম কী ঘোর অভিশপ্ত ছিল সমস্ত পরিবারটা?

'বছর ঘুরলে মা ফিরলেন, সঙ্গে—এ কাকে নিয়ে? এই কি সেই ননীর পুতলি, দুধের মেয়ে রিণা?—মা-র দেহমন গেছে ভেঙে : সব শুনলাম। পাছে চিঠিপত্রে এ-সব লিখলে কোনোরকমে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, সেই ভয়ে লিখতে পারেননি—আইরিণ—', ব'লে মিস টমাস নীরবে কাঁদতে লাগলেন।—'সেখানে ওর একটি মেয়ে হয়—ক্ষীণ, দুর্ব্বল, তিন মাসের বেশি বাঁচেনি। মার তাতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু সে শোকে একেবারে ভেঙে পড়ল। যেখানে শিশুটিকে কবর দেওয়া হয়, দিনরাত নাকি সেখানে প'ড়ে থাকতে চাইত। এর উপর ওর হ'ল দারুণ ব্রেন ফীভার। কোনোক্রমে বাঁচানো গেল তো—', মিস টমাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'এখন যা দেখছ। কেবল তখন আর একটু বাড়াবাড়ি ছিল। সর্ব্বদা আত্মহত্যা করতে চাইত; লোকজন—বিশেষত পুরুষমানুষ—এখনও ওর চোখের বালি। অনেকদিন ওকে নার্সিংহোমে রাখতে হয়েছিল। মা আর বেশিদিন বাঁচেননি,—মৃত্যুর আগে ওকে আমার হাতে দিয়ে যান। তাঁর আশা ছিল যদি কখনো ভালো হয়—কিন্তু ভালো সে আর হয়নি।' একটু থেমে—'তাই তোমাকে পেয়ে অমন করে —তোমার মুখের আদলটা—'

—'জানি—'

—'ও তো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই—ঐটুকুতেই তোমার ওপর এত টান হয়েছে।'

অনেক কিছুই এখন পরিষ্কার হ'য়ে গেল। এই জাপানী-প্রীতি, 'বেবি' ব'লে ডাকা, বেবির মতনই সেবা-যত্নের ঘটা, যেখান-সেখান থেকে যখন-তখন জাপানী ফানুস, ফ্যান, সূচিকার্য্য আরো কত কী কিনে নিজের ঘরে জমিয়ে রাখা।—হঠাৎ চমক ভেঙে দেখি, মিস টমাস মগ্ন হ'য়ে কি ভাবছেন। চোখোচোখি হ'তে কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম —'আপনি বুঝি আর বিয়ে করতে পারলেন না?'

—'এর পরে কি আমার মনের অবস্থা ঠিক ছিল? তাছাড়া এই যে এত ব্যাপার ঘটে গেল, জন তার কিছুই জানত না—লোকে জানত টাইফয়েডে রিণা পাগল হ'য়ে গেছে। যাকে জীবনের নিভৃত কথা বলতে পারব না, তাকে বিয়ে ক'রে ঠকাব কী ক'রে? আর সে যদি সব শোনে, তবে কি আমাকে আগের মত শ্রদ্ধা করতে, ভালোবাসতে পারবে?—তাই নিজেই স'রে দাঁড়ালাম। তবু—সে এসেছিল।'

—'কি বললেন তিনি?'

—'বললে—"ডোরা, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?" আমি ভয়ে ভয়ে বললাম —"এ-কথা কেন?" জন বলল—"রিণার দেখাশুনার জন্যে তুমি বিয়ে করতে চাও না, কিন্তু এটা কেন ভাবোনি যে সে যেমন তোমার, তেমনি আমারও বোন?"—দেখলাম ও কিছুই সন্দেহ করেনি। আমার বাধা আরো বেড়ে গেল। একদিকে ওকে বলা—ওর চোখে নিজের ছোট বোনটিকে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছোট করা, আর একদিকে চিরদিনের সাথীকে হারানো। এই দ্বিধায় দ্বন্দ্বে আমি কী যে করব স্থির করতে না পেরে কিছুদিনের জন্যে নরওয়ের এক ফিয়োর্ড-পল্লীতে গিয়ে গা-ঢাকা হ'য়ে রইলাম।

'সেখানে গিয়ে জনের মাত্র একখানা চিঠি পাই—"তুমি কেবল বোনের কথাই ভাবলে? আমি তবে তোমার কেউ নই? বেশ, ডোরা, তাই হোক, আমি আর কখনও তোমায় বিরক্ত করব না"।'

আমি সাগ্রহে বললাম—'তারপর?'

—'তারপর, যূথি, তার সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হয়নি। বলেছি না, অভিশপ্ত পরিবার?—জন আমি ফিরবার আগেই মারা যায়। ওর হার্ট দুর্ব্বল ছিল বরাবরই।'

চোখে আমার জল ভ'রে এল। উঠে ব'সে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম—'কেঁদো না মা, ভগবান্ কোন্ ভাঙন দিয়ে যে কী গড়তে চান—', কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

—'যূথি, ভারতবাসী যে পরজন্ম মানে—'

হঠাৎ উপরে ও সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল : একটু পরেই রিণা দরজার কাছে এসে উদ্বিগ্নভাবে বললে—'ডোরা, তুমি কি আজ সারারাত বেবিকে ঘুমোতে দেবে না? এত রাত অবধি আলো জ্বালিয়ে হচ্ছে কী শুনি?'

—'এই যে রিণি, এই যাই বোন।—সত্যি, রাত কম হয়নি।'

দে পরিচয়

শী ভাঙা-গড়া

পরিচয়

মেয়ে হয়েছে ব'লে বাড়ির সবাই অসন্তুষ্ট—প্রসূতির অন্যায় নয়?

প্রথমটি মেয়ে, তারপর দুটি ছেলে, তারপর এই সদ্যোজাত শিশু—পর পর দুই ছেলের পরে এই মেয়ে। নীরজা ভাবে, তবু কেন লোকের কথা শুনতে হয়? বিধাতার নিজের কাছে যদি পুত্রকন্যার সমান দর, তবে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মেয়েরই কপালে মানুষের কাছে তার এত অনাদর কেন? অন্তত, জন্মমুহূর্ত্তেও কি কেউ সত্যিকার আনন্দ নিয়ে শিশুকে বরণ করতে পারে না? 'মেয়ে হয়েছে'—বাড়িশুদ্ধ সবাইকার মুখভার! প্রত্যেকের যেন কি একটা আশাভঙ্গ হ'ল! শিশু গর্ভে থাকতে কতই না জল্পনা-কল্পনা —'ছেলে হবে, না মেয়ে—!'...ছেলে হবে আশায় সবাইয়েরই চোখে আলো ওঠে জ্ব'লে...মেয়ের আগমনীর সঙ্গে সঙ্গে সবই ধূলিসাৎ, সবাই—ক্ষুব্ধ। আত্মীয়-পরিজনের সমালোচনার ভয় : মা-ও নিভৃত প্রাণের দরদ—স্নেহ বাইরে প্রকাশ করতে সাহস করেন না। আঁতুড়-ঘরে শুয়ে শুয়ে নিরুপায় নীরজা অনেক অপ্রীতিকর কথা শুনতে পায়। যখন বড় কষ্ট হয়, জননীর স্নিগ্ধ চোখদুটির শান্ত কোমল দৃষ্টি নিয়ে অনাহূত অতিথির ননীর তনুখানি থেকে সব গ্লানি যেন নিঃশেষে মুছে নিতে চায়। কিন্তু কোনোদিন প্রতিবাদ করা দূরে থাক্, মুখ ফুটে কাউকে একটা কথাও না। বাড়ির সে বড়-বৌ হ'লে কি হয়, শাশুড়ি এখনো বেঁচে যে। তা ছাড়া, ছোট জায়েদের সঙ্গে ও কোনোকালেই এঁটে উঠতে পারে না—না কথায়, না চতুরতায়। ওর প্রকৃতির বিশেষত্ব কেবল বুকভরা বোবা স্নেহ আর সকলের সব কথা অতি সহজে মেনে নেওয়া। ঠিক সেজন্যেই তো ওকে কেউ মানে না।

মেয়েটি জন্মাবার দিন-দুই আগে সেজ-জা হিরণ্ময়ীর হাত দুখানি ধ'রে মিনতি ক'রে বলেছিল—'হিরণ, লক্ষ্মী বোন আমার, সতুকে একটু দেখিস। খুকি আর মণির জন্যে ভাবনা নেই, শোবেও ওদের ঠাকুরমার কাছে। শুধু এর জন্যেই যত—'

হিরণ পূর্ব্ব সম্পর্কে নীরজার বোন হয়—নিজে নিঃসন্তান। আশ্বাস দিয়ে বললে : 'দিদি, সতু কি আমার পর! কিছু ভেবো না তুমি, ভালোয় ভালোয় উৎরে এসো, সতুর সব ভার আমি নিলাম। তাছাড়া জানই তো কি রকম লক্ষ্মী ছেলে, এতটুকু বিরক্ত করতে দেখেছ কখনো?'...নীরজা নিশ্চিন্ত হ'ল। মনে মনে ভাবে,—হিরণ মেয়েটি বড় কাজের, যদিও—যাক্, সে-সব ছোটখাট ত্রুটি ধ'রে কি হবে, মনটা আসলে ওর ভালোই, আর সতুকে সত্যিই স্নেহ করে।

মাত্র আড়াই বছরের ছেলে, মায়ের অভাব বোধ করবারই কথা, কিন্তু সতু—ভাল নাম শিশির—ভারি শান্ত। সারাদিন যা পায় তাই নিয়ে আপন মনে খেলা করে। এইটুকু ছেলের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে কিন্তু ওর মধ্যে কেমন একটা নীরবতা আছে যা ওর বড় ভাই বা বোন—কারো মধ্যে নেই। খেলা করতে করতে মাকে মনে পড়লে উঠে গুটি-গুটি হেঁটে সোজা যায় মার ঘরের দিকে। হিরণ রান্নাঘরের বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে ডাকে —'সতু, সন্তু, এদিকে এসো দিকি বাবা, এসো তো ধন, এই দেখ কেমন রাঙা আলু

—এই নাও।' ওদিকে যেতে চাইলেই বারবার এরকম বাধা পড়ায় দুদিনেই সে বুঝে নিয়েছে কাকীমার এ-সব—শুধু ওকে মার কাছে যেতে না দেওয়ার ছল। এক একদিন কিছুতেই ভোলে না, নিষেধ না মেনে একখানা পা তুলে বলে—'মা দাই।' হিরণ বলে —'না লক্ষ্মী ছেলে, যেও না, ওখানে একটা কাঁদুনে খুকী এসেছে, গেলেই মারবে।' সতু বলে—'মাল্‌বে?'

—'হ্যাঁ মারবে, ব—ড্ড মারবে। ভারি দুষ্টু মেয়ে।' সতু মুখের মধ্যে ডানহাতের তর্জ্জনীটা পুরে উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবে। তারপরেই ফিরে খেলা করতে চ'লে যায়। হিরণের এত মায়া হয়, ভাবে—'আহা, বেচারি!'

খুকীকে যে সতুর বড়ই ভয়, তা নয়। ও কোনো কিছুতেই বিশেষ ভয় পায় না। তার একমাত্র কারণ—ওকে এর আগে কেউ কোনোদিন ভয় দেখায়নি। শান্ত স্বভাবের গুণে আর দেখতে বড় সুন্দর ব'লে বাড়ির সবাই ওকে ভালোবাসে, না চাইতে যখন তখন এটা সেটা দেয় হাতে। সতু মোটে আবদার করে না। আজ পর্য্যন্ত কোনো বিষয়ে জেদও করেনি, এটাই ওর ফিরে যাবার কারণ।

সেদিন দেউড়ির বারান্দায় ব'সে ওর বাবা দু-একটি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেমেয়ে তিনটি কাছেই ছুটোছুটি ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মণির ধাক্কা খেয়ে সতু যায় প'ড়ে। উঠান থেকে বারান্দা খুব উঁচু না হ'লেও নিচে কতকগুলো কাঠ পড়েছিল অনেকদিন থেকে। সতুর কপালে লাগল খোঁচা। খুকী ছুটে গিয়ে ভাইকে তুলে ধরল। বাবা দেখলেন, যেখানটা লেগেছিল—রক্ত জমে গাঢ় নীল হ'য়ে ফুলে উঠেছে। এ ঘটনাটির উল্লেখ ক'রে তারপরে কতবার বন্ধুদের কাছে বলেছেন—'আশ্চর্য্য যে ছেলেটি একটু কাঁদল না, খুকী কিম্বা মণি হ'লে স্রেফ ভয়েই কেঁদে খুন হ'ত।'

আর একদিন ঠাকুরমার ঘরের সামনে ব'সে বাড়ির তিনচারটি ছেলেমেয়ে মালসার আগুনে কাঁঠাল-বীচি পুড়িয়ে খাচ্ছে। খুকীই দলের সর্দ্দার, বয়সে এদের সবাইয়ের বড় —সবরকম দুষ্টু বুদ্ধি প্রথমে ওর মাথায়ই গজায়। ওরা কাঠি দিয়ে বীচিটা আগুনের ভিতর গুঁজে দেয়। একটু পরে ফট্ ক'রে শব্দ হ'লেই বোঝে এবার তুলবার সময় হয়েছে, কিন্তু গরম বীচিটা ওঠাবে কে? খুকী নিজে আবার বেজায় ভীতু, একটুখানি হাত দিয়েই 'উঃ আঃ' ক'রে সরিয়ে নেয়—দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে সাহস করে না। সতু খাবারের ভাগ পাবার আশায় একপাশে ব'সে থাকে। এদিকে দিদি ওর উপর খুব সদয়, রোজই কুলটা জামটা এনে খেতে দেয়। বীচিটা তুলতে না পেরে ওকে ডেকে বলে—'সন্তু, তুমি তোলো তো, লক্ষ্মী মাণিক, তোলো তো ওটা'—সতু এগিয়ে এসে আগুনের মধ্যে হাতটা পুরে দেয়। একটু খুঁজে দেখে সেই গরম গরম বীচিটা তুলে তাড়াতাড়ি মাটিতে রেখে দেয়। ওরা খুব হেসে উঠে' আরো বীচি আগুনে পোড়ায়, আর একটার পর একটা ওকে ওঠাতে বলে। সতু আপত্তি করে না ; জ্বালা করলে হাতখানা ঠাণ্ডা মেজেতে চেপে ধরে কিন্তু একটুও কাঁদে না। সেদিন থেকে ওর ভাইবোনেরা জেনে নিয়েছে—'সন্তু কিচ্ছুকে ভয় পায় না।'...

একুশ দিনের আগে নীরজার বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ। সহর থেকে বেশ খানিকটা দূর

এ-পাড়াগাঁটির রীতিনীতি খুব কড়া, বাঁধা-ধরা নিয়ম, এতটুকু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। পুরো একুশটি দিন প্রসূতি আর শিশুকে আলাদা রাখা হয়। যতদিন শাশুড়ি বা যে কোনো প্রাচীনা বেঁচে থাকেন, ততদিন আধুনিক-ভাবাপন্ন ছেলেদের যুক্তিতর্ককে আমলই দেওয়া হয় না। অবশ্য এ-কয়দিনের বিশ্রামে ভালো বৈ মন্দ হবার কথা নয়, কিন্তু দুঃখ এই যে, যে-ই তিনটি সপ্তাহ পার হ'য়ে যায়, তারপরে সে যে সবে আঁতুড়-ঘর থেকে উঠেছে সেকথা কেউই আর মনে রাখবার দরকার বোধ করে না। সুরু হয় নিত্যকার সেই অবিশ্রাম খাটুনি, সংসারের শত হাঙ্গাম পোয়ানো। তার উপর বাড়ির যদি হয় সে বড়বৌ, সব বোঝা তো আগে তারই ঘাড়ে এসে পড়ে। কোথাও কিছু খারাপ হ'লে ছোটজাদের উপর ততটা দোষ পড়বার কথা নয়। এ-বাড়িতে চিরদিন শাশুড়ির পরেই সংসারের সব দায়িত্ব বড়বৌয়ের। কিন্তু এমনই কপাল নীরজার, যে, আঁতুড়েও মনের শান্তি নেই। কেবল একটার পর একটা ভয়!...মণিটা যা দুরন্ত, হয়ত খিড়কীর পুকুরের ঘাটে নেমেছে। সেখানে কে-ই বা দেখছে ওকে! একবার জলে ডুবে যায়, সেই থেকে ওর জন্যে নীরজার জলের ভয় আর ঘোচেই না। মেয়েটা সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় টো-টো ক'রে বেড়ায়—যাহোক দুটো কিছু মুখে দেবার জন্যে দুপুরে একবার বাড়িমুখো হয়, তারপর সেই যে বেরোয়, সন্ধ্যার আগে আর ফেরেই না। অত বড় মেয়ে, ছোট ভাই দুটিকে যে একটু আগ্‌লাবে, মাকে একটু নিশ্চিন্ত হ'তে দেবে—কিন্তু না, ও-মেয়ে কোনো কাজের ধার-পাশ দিয়েও যায় না, কেমন যে পাগলের মত আপন মনে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে! এখন মা নেই, ওর প্রাণে যা একটু ভয়-ডর ছিল, তা-ও কি আর আছে?

হিরণ মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দেয়—'আর পারিনে বাপু তোকে নিয়ে, থেকে থেকে কেবল ঐদিকে ছুটবি। বোস্ এখানে, ব'সে থাক্। বড় বোনটাও এমন! হয়েছে তো আবার আরো একটা মেয়ে, এদিকে ছেলেটা অযত্নে যায় যায়। সারাদিন ওকে দেখে কে শুনি?'—হিরণের ঐ দোষ, অকারণে লোককে কথা শোনায়, বিষম বদ্‌মেজাজী যে।

যতই শান্তস্বভাব হোক, সারাক্ষণ একটা ছেলে কিছু একজায়গায় ব'সে থাকতে পারে না। আর, বাস্তবিক, হিরণেরও খুব দোষ নেই। শাশুড়ি তো নামে গৃহিণী, পুজো-আচ্চা, ঠাকুরসেবা আর ভোগ-আরতি নিয়েই রাতদিন ব্যস্ত। মেজ-জা নিরুপমা দূরে দূরে থাকতেই ভালোবাসে। কখনো নিজের ইচ্ছায় কিছু করল তো ভালো, নইলে ওকে কোনো কাজ করতে বলতে কারো ভরসা হয় না। হিরণ তাই মাঝে মাঝে সতুকে বাইরে চাকরদের জিম্মায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে সে কি করে না করে কেউ খোঁজ রাখে না। ওরা আপন মনে ব'সে কেউ সম্বৎসরের ঝুড়ি, টুক্‌রি, কেউ জাল, কেউ বা পাটি আর মাদুর বোনে। এই সেকেলিয়ানা-প্রিয় সম্পন্ন গৃহস্থঘরের অত্যাবশ্যক যত জিনিষ আজ পর্য্যন্ত বাড়িতেই তৈরি করানো হয়। বুড়ো গিন্নিমা যতদিন বেঁচে আছেন, এদিক দিয়ে চিরাচরিত প্রথা বা কাজের কোথাও কোনো ব্যতিক্রম হবার জো নেই।

বেশিদিন হয়নি—বাড়ির খুব কাছেই নতুন পুকুর কাটানো হয়েছে। চার পাড়েই নানাজাতের অসংখ্য কলাগাছ—অজস্র-প্রসূ। ভালো ভালো কলা-ই এত বেশি যে কাঁঠালি ও চাঁপাকলাগুলো কে খায় তার ঠিক নেই। বিক্রি ক'রে, পাড়ার ঘরে ঘরে বিলিয়ে,

চাকরবাকরদের দিয়ে-থুয়েও শেষ করা যায় না। নতুন মাটির জোরে কলা যেমন, তেমনি শাঁক-আলুও যা ফলেছে—। কাঁদি কাঁদি কলা আর সে আলু বাইরের ঘরের যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকে। পেকে নেহাৎ নষ্ট হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'লে অবশেষে গরুকে খেতে দেওয়া হয়।

সতু সুবিধা পেলেই যখন তখন গোটা গোটা কলা গিলে আসে। কেউ দেখবার নেই, বারণও করে না কেউ। চাকরদের কেউ হঠাৎ যদি বা দেখে ফেলে, গিন্নিমার বকুনির ভয়ে বাড়ির ভিতর আর বলেই না। তাছাড়া—ওরা ভাবে—ছেলেপুলে দু-একটা কলা খেলেই বা। ওদের ঘরে তো খাওয়াদাওয়ার কড়াকড়ি বা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই এত

সতু কাকীমার কাছে এসে দুধ খেতে চায় না, ভাতও ফেলে ছড়িয়ে উঠে যায়। হিরণ মহা মুস্কিলে পড়ে। সব রাগটা তখন পড়ে গিয়ে ওর মায়ের উপর। বেশ গুছিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। রাগের সময় ওর মনেই থাকে না কথাগুলো একটুও সঙ্গত হ'ল কি না। নিজের সন্তান হয়নি, অভিজ্ঞতাও নেই—কেন যে ছেলে খেতে চায় না, তার আসল কারণটা খুঁজে বা'র করবার কথা ওর মনেও আসে না। এক একদিন এমন সব কথা ব'লে বসে, যা বড়বোন বা বড়জাকে কেউ কখনো বলে না। মেজাজ ভাল থাকলে তার জন্যে নিজেই মনে মনে কত আফ্‌শোষ করে, কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? দুদিন পরে আবার যে-কে-সেই।

দিনকয়েক পরে দুপুরবেলা হিরণের মাথায় যেন খুন চেপে গেছে।...'এই ভর দুপুরের গরমেও তোর জন্যে একটু গা-গড়িয়ে নেবার জো নেই? বেলা না পড়তে উঠে আবার সেই হাঁড়ি ঠেলতে হবে না? তোর মা মহারাণী তো দিব্যি প'ড়ে আছেন, তাঁর আর কি? আমারই না ঘাড়ে এসে জোটে যত রাজ্যের হাঙ্গামগুলো—' এ-সব গোলমালের সময় নিরুপমা কখনো উঁকি মেরেও দেখে না, পাশ কাটিয়ে স'রে যায়। আজ কিন্তু ডেকে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে ভাই সেজবৌ?'

—'আর মেজদি, বোলো না—এইমাত্র ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে এলুম, দু'মিনিট না যেতে আবার—'

চেঁচামেচি শুনে শাশুড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন,—'কি হয়েছে বৌমা?'

—'এই দেখুন না মা, সতু আজ সারাদিনই যেখানে সেখানে—'

'সে কি! কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?'—

—'তা তো জানিনে মা, এদিকে স্নান করতে করতে আর কাপড় ছেড়ে ছেড়ে আমি যে হায়রাণ হ'য়ে গেছি—'

—'ওর মুখপুড়ী নবাবজাদী মা করছেন কী—শুনি? একটু কি উঁকি মেরেও দেখতে পারে না ছেলেটা কিরকম থাকে না থাকে—হজম হয় কি না হয়! চার ছেলের মা হ'ল, এ-সব কথাও কি এখনো শিখিয়ে দিতে হবে?'

—'তাঁর তো ভারি দায় পড়েছে মা, মেয়ে বুকে নিয়ে উনি এখন আরামে নাক ডাকাচ্ছেন।'

একটা কথাও নীরজার কান এড়ায়নি। এতক্ষণ নীরবেই শুনেছে, কিন্তু শেষের

কথাটায় হঠাৎ ওর ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। বারবার একই বিষয় নিয়ে খোঁটা দেওয়া! কেন, ও কি সাধ ক'রে মেয়ে ডেকে এনেছে? এ কী অবিচার!...

জগতের রীতি! এক অক্ষমের সব রাগ গিয়ে পড়ে অন্য এক অক্ষমের উপর! —উঠে ব'সে নীরজা ছেলেকে উদ্দেশ ক'রে বলে—'ওরে দস্যি ছেলে, তোর মরণও নেই? দশ কথা শুনতে শুনতে হাড় জ্বালাতন হ'য়ে গেল যে আমার—'

কথাটা শাশুড়ির কানে তুলে দিল হিরণ—'দেখছেন মা, তেজ কত দেখছেন আবার—'

শাশুড়ি আগুন হ'য়ে—'কি বললি লা?' ব'লে উঠোনে নেমে এলেন। 'মা হ'য়ে ছেলেটাকে এত বড় গাল? ছেলের চাইতে তোর মেয়ে হ'ল বেশি?' রাগে তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরয় না। ঘরের মধ্যে ক্ষোভে দুঃখে নীরজার বুক যেন ফেটে যায়। এর আগে কোনোদিন কোনো ছেলেমেয়েকে ও এতবড় কথা বলেনি। দুর্ব্বল শরীরে রাগটাও হয় বেশি। নইলে কী ক'রে সে এমন কথা বলতে পারল—বিশেষ ক'রে সতুকে —যে কোনোদিন ওকে এতটুকু বিরক্ত করে না!

রাত্রে কথাটা খুকীর বাবার কানে উঠতে দেরী হ'ল না। বুঝতে পারলেন তিনি সবই, তবু স্ত্রীর উপর হ'ল ভয়ানক রাগ। মার উপরও—অভিমান। ঐটুকু ছেলেকে উপলক্ষ্য ক'রে বৌয়েদেরই বা এত রেষারেষি জেদাজেদি কেন? মা ও-সব দেখেও দেখেন না। —গম্ভীরমুখে খাওয়া শেষ ক'রে বাইরের ঘরে চ'লে গেলেন। সকালে খুকিকে ডেকে ব'লে দিলেন যেন ভাইটিকে চোখে চোখে রাখে।

ছোট হ'লে কি হয়, সতুর বুদ্ধি খুব। ও বুঝতে পেরেছে যে বারবার পরিষ্কার করিয়ে দিতে বললে—এতদিন বলত অভ্যাসবশতই—কাকীমা খুসি হয় না। তার উপর, ভাতের বদলে দু'বেলা সাগুর বন্দোবস্তে বেচারা রীতিমত ভড়কে গেছে। নীরজার ছেলেমেয়েরা দুধসাগুকে ভয় করে যমের মত। সতু আর কাকীমার কাছে আসে না, দিদিও তার কিচ্ছু বোঝে না; ফলে অসুখ ভিতরে ভিতরে বেড়েই চলে।

ওদের বাবা শিকার করতে ভালোবাসেন। পৈতৃক আমলের এক প্রকাণ্ড বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ে চ'লে যান, দিনকয়েক পরে শিকার সঙ্গে ক'রে বাড়ি ফেরেন। এটা এ-বাড়ির পক্ষে একেবারে অনাচার; বন্দুক রাখতে হয়েছিল শুধু চা-বাগানে আগেকার অনাবাদ জঙ্গলের দিনে হিংস্র বুনো জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। মা ওঁর কতবার অনুনয় ক'রে, রাগ ক'রেও ব'লে দেখেছেন—কিন্তু ছেলে শোনে কই?

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে কে এসে তাঁকে খবর দিয়ে গেল নতুন পুকুরে একটা মস্ত বুনো হাঁস চরতে এসেছে, তাক্ করতে একটুও কষ্ট হবে না। এ-লোভ সামলানো দায়। চুপি চুপি বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুকুর আর বাড়ির মাঝখানে শুধু একটুখানি ফাঁকা মাঠ। পাড়ে দাঁড়িয়ে কেউ জোরে কথা বললে বৌ-ঝিরাও শুনতে পায়।

সবে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। এমন সময় গুড়ুম ক'রে বন্দুকের গম্ভীর আওয়াজ!—নীরজার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিলে...কোলের মেয়ে চম্‌কে কেঁদে উঠল। স্বামী শিকারে গেলে বরাবরই ওর মনটা খারাপ হ'য়ে যায়, কিন্তু এর আগে কোনোদিনই বাড়ির

তল্লাটে তিনি প্রাণিহত্যা করেননি। শাশুড়ির মত সেও মারা-কাটা একেবারেই সহ্য কর
পারে না। কেমন একটা অজানা শঙ্কায় ওর মনটা ওঠে ভার হ'য়ে।

আবছা অন্ধকারে উঠোনে ছেলেমেয়েরা তখনও খেলা করছে। বাড়ির রাখা
ছেলেটা—বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ সামনে এসে, 'এই দেখ এটা কি' ব'লে ম
রক্তাক্ত হাঁসটা তুলে ধরল। রান্নাঘর হ'তে বৌয়েরা 'দেখি, দেখি' ব'লে এগিয়ে এ
সতু এতক্ষণ দিদির খেলার হাঁড়িটা ধ'রে বসেছিল। সকলের দেখাদেখি সেও উঠে এ
কৌতূহলে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে গেল। রাখাল কিছু না ভেবেচিন্তে পাখিটাকে শূন্যে দুলি
হঠাৎ একেবারে সতুর চোখের সামনে ধরল। তার দুমড়ে-পড়া ভাঙা ঘাড় থেকে ট
টস ক'রে রক্ত ঝরছে তখনো। সতু ভয়ে শিউরে কেঁদে ওঠে। হিরণ ছুটে এসে ছেলে
কোলে তুলে নেয়। 'ষাট, ষাট, কেঁদো না মাণিক, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। আচ্ছা হার
তোর ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই রে? ছেলেটাকে ভর সন্ধ্যেয় মিছিমিছি ভয় দেখালি
জ্বরটর হয় তো বাবুকে ব'লে মজা টের পাওয়াব এখন। যা, দূর হ'য়ে যা—'

হারু মুখ কাঁচুমাচু ক'রে 'কে জানত মা এত ভয় পাবে—কখনো তো—' বল
বলতে স'রে পড়ল।...

সেই থেকে সতুর অসুখ ভয়ানক বেড়ে গেল। আজকাল ও আর খেলাও কর
চায় না। কেবলই হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। থেকে থে
পেটে হাত না দিলে কেউ বুঝতেও পারত না কত ব্যথা করছে ওর। সঙ্গে সঙ্গে জ্ব
উপোস দিয়ে প'ড়ে থাকে, তবু সাগু খেতে চায় না। দুদিন না যেতেই এমন রো
হলদে বরণ হ'য়ে গেল—! ওর যা কিছু আব্দার শুধু দুটি ভাতের জন্যে। মায়ের পেছ
পেছন গিয়ে আঁচল ধ'রে কাঁদে। নীরজার ইচ্ছা হয় শুধু নুন দিয়ে মেখে দুটি নরম গর
ভাত ওর মুখে দেয়। কিন্তু সতুর বাবার কড়া নিষেধ—আমাশায় কিছুতেই যেন ভা
দেওয়া না হয়। চিকিৎসা করছেন তিনি নিজেই। নীরজার এই জোলো হোমিওপ্যাথি
ওষুধে একেবারেই আস্থা নেই, কতবার আপত্তি করেছে, কিন্তু ওর কথা শোনে কে
ঠাকুরমা দেব-দেবীর কাছে 'মানৎ' করেন, জপের মালাটি সতুর কপালে ছুঁইয়ে যান
কিন্তু অসুখ সারে না। ক্রমে যখন এমন হ'ল যে ছেলে আর উঠে হাঁটতে পারে ন
তখন গ্রামের এক অবশ্রান্ত সাব-এসিষ্টান্ট সার্জ্জনকে ডেকে আনা হ'ল।

সতুর এবার বড়ই কষ্টের দিন। বাবার ওষুধ ছিল খেতে বেশ মিষ্টি, তাই ও আপ
করত না। কিন্তু এখন ডাক্তারের এলোপ্যাথিক মিক্‌শ্চার জোর ক'রে হাত পা চে
ধ'রে নাক টিপে খাওয়াতে হয়। এত দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে এ ক'দিনেই যে, এমন ক'
ওষুধ খাওয়াবার পরে বেচারা খানিকক্ষণ একেবারেই নির্জীবের মত প'ড়ে থাকে। দে
দেখে নীরজার মনে হয়—এই এত দুঃখের জগতেও শিশুর রোগ-যন্ত্রণাভোগের তু
দুঃখ বুঝি আর নেই!

আটদিন যেতে না যেতে সতু ভাতের জন্যেও আব্দার করা ছেড়ে দিল। বালিশের উপ
মাথাটি কেমন অসহায়ভাবে এলিয়ে দিয়ে বিছানায় একেবারে নেতিয়ে প'ড়ে থাকে
আড়াই বছরের ছেলেকে পাঁচবছরের ছেলের সমান লম্বা দেখায়। নীরজা বারবার মুখে

গছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকে, 'সন্তুমণি ; ভাত খাবে বাবা? ভাত খাবে, ধন?' ওর আশা -যদি ভাতের নাম শুনেও সে মায়ের সঙ্গে এক-আধটা কথা বলে. কিন্তু সতু আর চয়েও দেখে না, মার কথা হয়ত ওর কানেও পৌছল না।

অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখে দূর গ্রাম থেকে এক খ্যাতনামা শিশু-চিকিৎসককে আনতে লাক পাঠানো হ'ল। কেন যে এঁর কথা আগে কারো মনেই হয়নি কে জানে!

একদিন মন্দিরের ব্রহ্মচারী ঠাকুরকেও ডেকে আনা হ'ল। তিনি এসে অনেকক্ষণ ারবে প্রার্থনা ক'রে বললেন, 'মা, তোমার খোকার এই বিছানার চারদিকে আমি এক ক্ষণ-মন্ত্রের গণ্ডি দিয়ে গেলাম। সাতদিন ওকে এখান থেকে নড়াবে না, বিছানা বদলাবে া, যেমন আছে ঠিক তেমনি রাখবে। সাতদিন পরে আমি আবার এসে দেখে াব।'...

দিন দুই পরে সতুর অবস্থা একটু ভালো ব'লে মনে হ'ল। কবিরাজ তখনো এসে পৌছননি। দুপুরে খুকি—সতুর দিদি—বিছানার কাছে গিয়ে উস্‌খুস করছে। ও প্রায়ই ।-ঘরে আসে। সতু কেন অমন ক'রে শুয়ে থাকে সেটাই হ'ল ওর ভাবনার বিষয়। াঝে মাঝে মার রোদনস্ফীত আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কত-কি ভাবতে চেষ্টা করে। ।ক একবার রুগ্ন ভাইয়ের শিথিল হাতখানি হাতে নিয়ে দেখে নেড়েচেড়ে। নীরজার ়খে শুধু এই সময় একটু হাসি ফুটে উঠে' আবার তখনি মিলিয়ে যায়। মেয়ে যদি ানত কিসের ভয় ওর মার বুকে গুরুভার পাষাণের মত চেপে আছে! একদিন কি নে ক'রে শুধোলো—'বল্ দেখি মা, ভাইটি তোর বাঁচবে তো? বল্—'

খুকি চুপ ক'রে খানিক মার মুখের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কে যেন জোর ক'রে সই আট বছরের মেয়ের মুখ দিয়ে বলালো—'বাঁচবে না।' নীরজা 'ছি, মা, ও-কথা বলতে নই' ব'লে চোখের জল ফেলে। মেয়ে থতমত খেয়ে বেরিয়ে গেল সে-ঘর থেকে।

ারদিন সতু আরো শান্তভাবে ঘুমোয়। নীরজার বিশ্বাস ছেলে ওর এ-যাত্রা বেঁচে গেল। াজই যে কোনো সময় কবিরাজ এসে পৌছবার কথা।

দুর্ব্বল শরীরে এ কয়দিন খেটে খেটে, তার উপর দুশ্চিন্তায় ও বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে ়ড়েছে—এতদিন নাওয়া খাওয়া জ্ঞান ছিল না। আজ যখন দেওর সুরেন এসে বললে ·'সতুর জন্যে আর কোনো ভয় নেই', তখন কোথা থেকে বিশ্বের ক্লান্তি ওকে ধরল ারে। শাশুড়ি একবার বলতেই নীরজা সেখানেই শু'য়ে পড়ে।....হঠাৎ স্বপ্নের মতন ·অস্ফুট, অস্ফুটভাবে শোনে সতু কাঁদছে—দুর্ব্বল, করুণ সুরে! ধড়মড় ক'রে উঠে 'সে দেখে ঘর অন্ধকার, সতু নেই!

খুকি চেঁচিয়ে ডাকে, 'ঠাকুমা সন্তুর গালের ঘায়ে ওষুধ লাগাচ্ছিলেন, মাগো—শুনছ মা? তাইতে ও কাঁদছে আর হাঁপাচ্ছে—বড্ড লেগেছে, মা—'

—'ওগো কেন তোমরা ওকে বিছানা থেকে তুলেছ, ঠাকুরের মানা-যে—', নীরজা াকুল হ'য়ে ছুটে আসতে না আসতে সতু আর একবার 'এঁ' ক'রে কেঁদে, আর একটুখানি ়ড়েচড়ে স্থির হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে—যে-সময় রক্তমাখা বুনো হাঁসটাকে দেখে ও ভয় পেয়েছিল,

তার ঠিক দু'সপ্তাহ পরে, সেই একই সময়ে—সতুর অমল শিশুপ্রাণ কোন্ অনন্তে যে মিলিয়ে গেল...

ঘরের ভিতর ওর তনু দেহখানি ধবধবে নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তাই আগলে ব'সে দু'ভাই-বোন—খুকি আর মণি। পাড়ার যে কেউ দেখতে আসছে অমনি মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্‌ছে—'চুপ, চুপ, গোল কোরো না। সেজকাকা বলেছেন ও অনেকদিন পরে ঘুমোচ্ছে, জ্বর সেরে গেছে।' সবাই চোখের জল চেপে স'রে যায়।

খানিক পরেই সতুকে উঠিয়ে নিতে আসে। মণি পিছন পিছন যায়, ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'সন্তুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, সোনাকাকা?'

—'সহরে, হাঁসপাতালে। আবার আসবে। যা, ঠাকুমার কাছে যা।' ভাইবোন ফিরে আসে. . .

একদিন দু'দিন—চার-পাঁচদিন যায় কেটে। সন্তু তো কই আর আসে না? মা রোজই কাঁদে। কেন? কিছু না বুঝেও ওদের কান্না পায়। মণি কঞ্চির রাশ কুড়িয়ে এনে খাটের নিচে জড়ো ক'রে রাখে। কবে একবার সতু দাদার কাছে একটা কঞ্চি চেয়ে পায়নি; মণি উল্টে ওর পিঠে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'পালা এখান থেকে, আমার লাঠি তোকে দেব না।' আজ অবোধ শিশুর বিরহ-কাতর প্রাণ সেদিনকার সেই নিষ্ঠুরতা, ছোট ভাইটিকে বিমুখ করার বেদনা ভুলতে—যেখানে যত কঞ্চি বা লাঠি দেখে, তুলে এনে জমিয়ে রাখে...কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে—'ভাইটি ফিরে এলে তাকে দেব।'

খুকি যখন তখন যাকে তাকে শুধোয়—'সন্তু কবে আসবে?' কেউ জবাব দেয় না। সতুর যাওয়ার দিন থেকে বাবার দেখা পাওয়া যায় না। ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান, সেজকাকীমা আঁচলে চোখ মোছে! খুকির মনে অস্পষ্টভাবে একটা ভয় আসে। কোথাও কী যেন একটা হয়েছে! সমস্ত বাড়িখানার এ কী অদ্ভুত থম্‌থমে ভাব!...ভাইটির কথা জানতে চাইলেই-বা সবাইকার মুখ এমন হ'য়ে যায় কেন?—মণি আর খুকি অনামা বিষাদে দিন দিন শুকিয়ে ওঠে। খুকি ভাবে—'তবে কি—তবে কি —সন্তুকে ঐ নদীর ধারে—যেখানে নাকি সুরোর দাদাকে—বাঃ, তা কেন হবে? সুরোর দাদা তো এক্কেবারে ম'রে গিয়েছিল। হ্যাঁ, মড়া—নড়ত চড়ত না। সতু গেছে সহরে। কিন্তু আসেই না...একেবারেই আসে না কেন?'...নিজের নিজের দুঃখ নিয়ে সবাই ব্যস্ত, এ দুটি শিশুর মনের বেদনা কেউ বোঝে না। ওরা ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারে না ব'লে ওদের প্রাণের শূন্যতা কারো চোখে ধরা পড়ে না।

একদিন বাড়ির রাখাল ছেলেটাই ব'লে ফেলল—'সে ম'রে গেছে রে, আর আসবে না।'

খুকির মাথাটা কেমন ক'রে ওঠে। ভয়ানক রাগ ক'রে বলল—'মিথ্যে কথা বলছ? বাবাকে ব'লে দেব না?'

—'না রে, সত্যি বলছি। ও মড়া হ'য়ে গিয়েছিল—ওকে সেদিনই পুড়িয়ে ফেলেছে।'

মণি একটু হাঁ ক'রে থেকেই কেঁদে ফেলল। তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধ'রে খুকি বাড়ির ভিতর চ'লে গেল। রাখাল কি বলেছে মার কাছে নালিশ করতেই নীরজা মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়ল। মণি ভয়ানক কাঁদতে থাকে, হিরণ এসে ওকে কোলে তুলে নিল। খুকি খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে সবাইকে দেখে। তারপর কেমন বিহ্বলের মত ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।. . .

মৃত্যুর সাথে এই ওর প্রথম পরিচয়!

ভাঙা-গড়া

মাত্তর বছর তিনেকের ছেলে—কিন্তু কী যে দুরন্ত—! রাতদিন কেবল আব্দার আর বায়না আর কান্না! কাঁদতে একবার আরম্ভ করলে থামানো দায়, এটা ভাঙবে ওটা আছড়াবে, হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকারে গলা ফাটিয়ে মেজের এধার থেকে ওধারে দেবে গড়াগড়ি। —সে কী কাণ্ড!—মা সামলাতে পারে না, বৌদিদি কিল চড়টা খেয়ে ছুটে পালায়—জ্যেঠাইমা নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোরগোল করেন। ছোটদিদি কনক তো ভয়ে ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। বাস্তবিক এত ছোটবেলা থেকেই এমন জেদি ছেলে কেউ জন্মে দেখেনি। পাড়াপড়শি কেউ বলে—'বেঁচে থাকলে ও-ছেলে বর্গী হবে' ; কেউ বা বলে—'পাগল হবে—সহজ মানুষের কি এতটা রাগ হয় কখনো?'—কোন্ আন্দাজটা পরে ঠিক হবে? এ-সবের একটাও কি? দেখা যাক্।

সেদিন সকালে এম্‌নি ধুলোকাদা মেখে ও গড়াগড়ি দিয়েছে। দৈনিক বরাদ্দ কলার একটার জায়গায় দুটো চেয়ে বসেছে ; মার নিষেধ আছে, তাই বৌদি দেয়নি এই অপরাধ। ব্যস্ আর যায় কোথায়, লাথিয়ে, খই দুধ ঢেলে ছড়িয়ে একাকার ক'রে ধরাশয্যা। ও-ঘরে বড়দা আইনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, চীৎকারে কাজের ব্যাঘাত হ'লে অন্যদিন হুঙ্কার দিতে ছাড়েন না, যদিও তাতে প্রায়ই হিতে বিপরীত হয়। আজ হঠাৎ কি মনে হ'ল, উঠে এসে টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দোল্‌নার কাছে নামিয়ে দিলেন। সেখানে ছ'মাসের কচি খুকি ঘুমোচ্ছিল, গোলমালে আচমকা জেগে উঠে কোকিয়ে কেঁদে উঠল। খোকা তারণ নিজের কান্না বন্ধ ক'রে অবাক হ'য়ে খুকির দিকে চেয়ে রইল, এ-বাড়িতে যে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁদতে বা অত চেঁচাতে পারে আর কেউ, এ তথ্য ও এই আজ নতুন আবিষ্কার করলে। খুকি টুকটুকে পা দু'খানি আছ্‌ড়ে গায়ের উপর থেকে কাঁথাখানি ফেলে দিতে দিতে, ছোট ছোট কচি মুঠোতে লাল জামাটি চেপে ধ'রে কি একরকম অদ্ভুত মুখ ক'রে কাঁদছে! অসময়ে কান্না শুনে বধূ রান্নাঘর হ'তে উঠি-পড়ি ক'রে ছুটে এসেই থমকে দাঁড়াল, দোলনার উপর ঝুঁকে পড়ে তারণ অবাক কৌতূহলে দেখছে আর অদূরে দাঁড়িয়ে স্বামী হাসছেন।

—'মেয়েটা কেঁদে সারা হ'য়ে গেল—আর তুমি বেশ মানুষ তো, ঐ দস্যিটাকে ছেড়ে দিয়ে কি এত রঙ্গ দেখছ শুনি? যদি কিছু ক'রে বসে?'

খুকির জন্মদাতা আস্তে বললেন—'আহা, রাগ করো কেন? মেয়ের তোমার কিছুই হয়নি। হাসছি আমি তারণটার কাণ্ড দেখে : দেখছ না একেবারে "থ" হ'য়ে গেছে, কাঁদতে পর্য্যন্ত গেছে ভুলে।'

—'তা তো দেখছি, এদিকে মেয়েটা যে কেঁদে নীল হ'য়ে গেল—সে খেয়াল আছে?' অথ খুকিকে নিয়ে জননীর প্রস্থান।

তারণ এতক্ষণে সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে স'রে ব'সে দাদার মুখের দিকে চেয়ে কচি দাঁত ক'টি বের ক'রে হেসে বললে—'দাইদা, বাব্বী!'

অবশেষে এই একটা উপায় পাওয়া গেছে। রাগে ছেলে যখন চোখমুখে আগুন ছিটিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তোলে, তখন 'বাবীর কাছে যাবি খোকা? ও-ই, ও-ই যে বাবী ডাকে' বললেই খোকা তখনি শান্ত হ'য়ে এদিক ওদিক তাকায়। খুকির দোলনার পাশে বসিয়ে দিলে তার শিশু ভাষার বিচিত্র কলরব শুনতে শুনতে নিজের আব্দারগুলো পর্য্যন্ত ভুলে যায়। অতঃপর খুকিকে দোল দেওয়া ওর দৈনিক কাজ। প্রথম প্রথম বৌদিদির ভয় ছিল পাছে সে হঠাৎ কিছু ক'রে বসে, কি রকম দুষ্টু ছেলে জানে তো সবাই! কিন্তু তারণ খুকির কাছে শান্তির বালবিগ্রহ! শুধু মাঝে একদিন ওর জ্বলজ্বলে চোখদুটোকে কি ভেবে একটু বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চেয়েছিল, খুকির তাতে ঘোরতর আপত্তি দেখে আর কোনোদিন সে গবেষণাও করতে এগোয়নি।

তারণের ছোটদিদি কনকের বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার পর বাড়িতে এখন ছেলেমেয়ে শুধু দুটি—সে আর তার জাঠ্‌তুত ভাই মহিমের একমাত্র সন্তান—ছবি। শিশু মুখের আধ ভাষায় সেই যে ও 'বাবী' নামকরণ করেছিল, সে নামই ছবিতে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে যে কী ক'রে—নামলীলার কোন্ বিচিত্র রহস্যে!—মহিমের দেওয়া বড় সাধের নাম 'আরতি' পোষাকী কাপড়ের মত যত্নে তোলা থাকে, কালেভদ্রে ব্যবহার হয়।

তারণ পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দ্দার। পুকুর, দেউড়ি, খিড়কির বাগান ওদের কোলাহলে নিত্য সরগরম। গাছের নিচের ডালের ফলপাকুড় কখনো গাছে পাকতে পায় না। খিড়কীর পুকুরের সংলগ্ন পুরোণো লিচু গাছটার সব চেয়ে মোটা আর নিচের ডালটি সর্দ্দারের সিংহাসন। সাধু অসাধু নানা উপায়ে সংগৃহীত সময়ের ফলমূল, আচার মোরব্বা, বাঁশি, খেলনা, রঙীন কাগজ যেখানে যে যা পায় সব এনে একত্র করে এবং তারণ সেগুলো সকলের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে দেয়। যেমন সকল বিষয়ে, তেমনি এতেও সবাইকে সর্দ্দারের বিবেচনা তথা রায় মেনে চলতে হয়, নইলে রক্ষে আছে? এজন্যে ওর অধীনে পাড়ার মেয়েরা বড় কেউ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারেনি, কেবল এক ছবি ছাড়া! এটা বলতেই হবে যে ছবির নিজের গুণ আছে যথেষ্ট, একেবারে কাকার মনের মত। নিন্দুক লোকে বলে মেয়ে না হ'য়ে ওর ছেলে হ'য়ে জন্মানো উচিত ছিল। কেউ বা বাঁকা কটাক্ষ ক'রে বলে—'এতটা হ'ত না, শুধু সঙ্গ দোষেই—।' গায়ে হাতে কোথাও পরে না একটা গয়না, মাথার চুলে মাকে দিতে দেয় না হাত। কাপড়ের

আধখানা প'রে বাকি আধখানা জড়ায় কোমরে ; ভুলেও কখনো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যায় না পুতুল খেলতে বা 'চড়িভাতি' করতে। ও কেবল 'ছোট্কা'র হুকুমে ওঠাবসা চলাফেরা করবে। এমন অনুগত অনুচর কার না প্রিয় হয়? অন্য মেয়েরা আড়ালে গাল দেয়, ভয়ে সামনাসামনি কিছু বলতে পারে না—পাছে তারণ কোন এক ফাঁকে এসে লাঠির এক ঘায় পুতুল ও পুতুলের হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙে চুরমার ক'রে রেখে যায়। এ-হেন তারণ ও তার ভাইঝি যে গ্রামের নিরীহ শিশুদের ভীতিপ্রদ আদর্শ এবং দুষ্টু ছেলেদের প্রাণপ্রিয় সুহৃদ হ'য়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাছাড়া দুরন্তপনার সুবিধাও বিস্তর। তারণের বড় ভাই অপূর্ব্ব দূর কলকাতায় কলেজে পড়ে। সুদীর্ঘ ছুটিতে ছাড়া বাড়ি আসতে পারে না। মহিম কার্য্যোপলক্ষে বেশির-ভাগই—সহরের বাড়িতে থাকেন, অবসর পেলে টুক্ ক'রে গ্রামে চ'লে আসেন, কিন্তু কখন আসবেন বা যাবেন তার হদিশ কেউ জানে না। এজন্যেই যা একটু সতর্ক থাকতে হয়, নইলে তারণ বলে, ওরা আরো কত 'মজা' মারত।

জ্যেঠাইমার মাঝে মাঝে ওদের পড়াবার খেয়াল হয়। কখনো কখনো দুপুরে দুজনকে কাছে বসিয়ে রামায়ণের গল্প শোনাতে আরম্ভ করেন—উপদ্রবটা যদি তাতে একটু কমে —সে-ও কম লাভ নয়। কিন্তু গরমে আর সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে শীগগীর বুঁজে আসে তাঁর চোখ।

সেবার মহিম বাড়ি এসেছেন। কি একটা দরকারী কাজে ও-পাড়ায় বিস্তর ঘোরাঘুরির পর অনেক বেলায় ফিরে নেয়ে খেয়ে এইমাত্র একটু বিশ্রামের জন্য শুয়েছেন। বধূ তখনও রান্নাঘরে, বিকেলের খাবারটা গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। ছোট শাশুড়ি পাড়ায় গিয়েছেন, মহিমের মা ভিতর বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে। হঠাৎ খিড়কির বাগানে ছেলেদের চেঁচামেচি, ভাঙা টিনের ও কাঠের বাক্সে কাড়া-নাকাড়ার ডামাডোল—হুলুস্থুল ব্যাপার! —কিন্তু সব ছাপিয়ে ছবির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের সরোদন চীৎকার—'ও ছোটকা, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও—আমি আর রাবণ হব না—ও ছোট্কা!—ওগো মাগো, ছোটকা আমায় মেরে ফেললে গো'—সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে বাবা, ঠাকুরমা, মা-র ঊর্ধ্বশ্বাসে একত্র আবির্ভাব তথা ওদিকে বালখিল্যদের রণে ভঙ্গ। তারণের কান ধ'রে বড়দা ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল—আজ রাম-রাবণের যুদ্ধাভিনয়ের পালা ঠিক করা ছিল। কথা ছিল ঠাকুরদের কেষ্ট হবে রাবণ আর তারণচন্দ্র স্বয়ং রাম, সীতা-হরণ করা হবে ছবিকে। তবে—রামায়ণের উদ্ধারপর্ব্বটা একটু এগিয়ে নিয়ে—রাবণ ভিক্ষা নেবার ছলে যে-ই সীতাকে চেপে ধরবে, অমনি অকুস্থলে রামচন্দ্র ছুটে এসে তার গলা ধরবেন টিপে, এবং সেখানেই তুমুল রাম-রাবণী যুদ্ধ বাধিয়ে সীতার তখন-তখনই উদ্ধার সেরে অযোধ্যায় রাজা হ'তে চ'লে যাবেন। কিন্তু সব ফাঁসালে ঐ কেষ্টা। সমস্তই ঠিক, অভিনয় সুরু হবে—এমন সময় ভয় পেয়ে ও এমন বেঁকে দাঁড়াল যে ওর দেখাদেখি দলের আর কেউই রাবণ হ'তে ভরসা পেল না। অগত্যা ছবিকেই রাবণ হ'য়ে কেষ্টাকে সাজাতে হ'ল সীতা—নইলে যে প্লে মাটি।—তারণের অপরাধ কী? যুদ্ধে মার খাওয়া যে রাবণের অদৃষ্টলিপি—সত্যি কি না জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞেস করো—সে কি রামায়ণ মিথ্যে ক'রে তাকে

বাঁচিয়ে দিতে পারে? তবু তো সে রাবণকে মাটিতে ফেলে টুঁটি চেপে ধরেছিল মাত্র, একেবারে মারেনি। ছবিটা এমনি বোকা, ভাবলে বুঝি সত্যিই মেরে ফেললে। সে নিজে রাবণ হ'লে হাজার মারলেও টুঁ শব্দটি করত নাকি?

বৌদি বললে—'তা-ই কেন হ'লে না? মানাতোও ভালো, আর তোমার হনুমানী দলটিও তখন স্বচ্ছন্দে সবাই মিলে গলা টিপে রাবণ-বধ করতে পারত—পাড়া জুড়ুত।'

—'হুঁ, তা পারি কখনো? রামচন্দ্র মহাবীর ছিলেন না? খুব ক'ষে যুদ্ধু করবেন কিনি শুনি? ওরা কেউ পারে মোক্ষম লড়াই করতে?—তাই তো আমাকে—বৌদি, রামায়ণ তো পড়নি, তাই জানো না—'

বৌদি হেসে বললে—'বীরপুরুষ!'

রামায়ণী কথার পরিণাম দেখে জোঠাইমা তো অবাক! সমস্ত শুনে মহিম হাসবেন কি বকবেন! খুড়িমা কখন এসে পিছন থেকে সব শুনেছেন—এখন এগিয়ে এসে বললেন, 'মহিম, নিজের চোখে দেখলি তো সব? নিত্যি এই ব্যাপার—জ্বালিয়ে খেলে! সারাদিন একটা-না-একটা লেগেই আছে, মেয়েটাকে শুদ্ধু ডানপিটে ক'রে ছাড়লে। ওকে কি লিখতে পড়তে দিবিনে তোরা? বয়সও তো কম হয়নি ছেলের—শেষটা কি আকাট মুখ্যু হ'য়ে থাকবে চিরটাকাল?'

মহিম বললেন—'খুড়িমা, স্কুলে দিলেই কি তোমার ছেলে রাতারাতি নিরীহ ঠুঁটো জগন্নাথ ব'নে যাবেন ভাবো? এখানে বরং ঘরের মেয়েকে রাবণ-বধ করছে, সেখানে পরের ছেলের কীচক-বধের দায় সামলাবেন কোন দায়রা?'

—'তবে কি করবি কর বাবা, যা ভালো বুঝিস। ওকে সামলানো—সে আমার বাবা এলেও পারবে না।'

বৌদি বললে—'মেয়েটাও কি হয়েছে কম দস্যি না কি? মা গো মা—চৌপর দিন ছেলেদের সঙ্গে টো টো—এত খেলনা, পুতুল পুঁথির গয়নাপত্তর এনে দিই, তা মেয়ের ও-সবে মনই ওঠে না।'

মহিম বললেন—'ক'দিনই বা দস্যিপনা করবে মেয়ে? যে ক-টা দিন একটুখানি ঘোরাফেরা করতে পারে, করেই নিক না—'

—'ও-ই জন্যেই তো—তোমার প্রশ্রয় আছে বলেই না—তোমার আর কি বলো না? তুমি তো বাড়ি থাকো না, মেয়েকে নিয়ে রাজ্যের লোকের দশরকম কথাও শুনতে হয় না—', বধূর মুখভার ক'রে প্রস্থান।

অনেক ভেবে মহিম তারণকে সহরে নিয়ে যাওয়াই ঠিক করলেন। এখানে স্কুলে দিলেও ওকে দেখে কে? ও কি কাউকে মানবে, না পড়াশুনা একটুও করবে? তাছাড়া অনেকদিন থেকে তাঁর ইচ্ছা ছিল মেয়েকেও যথাসম্ভব লেখাপড়া শেখাবেন। এইবার সকলের সকল রকম আপত্তি নাকচ ক'রে তিনি ওকে বোর্ডিং-এ ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। তারণকে বাসায় নিজের সঙ্গে রেখে স্কুলে দেওয়া হ'ল।

অকস্মাৎ এরকম বন্দোবস্তে ছবি কতবার ভেবেছে : এমন জানলে সে কক্ষনো কাঁদত না—ছোটকাকা যতই না তাকে রাবণ সাজিয়ে গলা টিপে ধরুক বা কাটবার জন্যে

খাঁড়া ওঠাক। কিন্তু এখন তো হাজার সৎ-সংকল্পেও আর আগের দিনগুলো ফিরে পাওয়া যায় না। বোর্ডিংএ ওর বয়সী মেয়ে অনেক, কিন্তু সবাই সারাক্ষণ যেন ওর পেছনেই লেগে আছে। লিচুটা পেয়ারাটা পাড়বার জন্যে গাছে চড়তে না চড়তে মেয়েরা চোখ কপালে তুলে 'মাসী'কে নালিশ করতে ছোটে। একটু যদি সাহস আছে ওদের! খেলার মধ্যে শুধু কড়ি, আগডুম-বাগডুম, কাণামাছি, লুকোচুরি—ছবির ও-সব একটুও ভালো লাগে না—কোনোদিনই লাগত না। ওর প্রাণটা থেকে থেকে কেবলই দেশের বাড়ির সেই বন-জঙ্গল, ডোবা-নালা, পুকুর-পাড় ও আমবাগানের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। সহরে মানুষ কী সুখেই বা থাকে! সে শুধু শুক্রবারের জন্যে দিন গোণে। শনি, রবি—দুদিন ছুটি। বাবা নিতে আসেন ও-ই সামনের গেটটার ওধারে যে বড় রাস্তা আছে, ওখান দিয়ে হেঁটে। বিকেলে চুল বেঁধে মুখ মুছে তৈরি হ'য়ে ছোট পোঁটলাটি হাতে নিয়ে দোতলার খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেই সে বাবাকে আসতে দেখতে পায়। আর—এ-কথা কিন্তু ওরা দুজনে ছাড়া আর কেউই জানে না—ছোট্‌কা অনেক আগে থেকে গেটের ধারের ঐ মস্ত বকুল গাছটার উপর উঠে ব'সে থাকে—দুবার 'কু-উ' ক'রে ছবিকে নিজের উপস্থিতির কথা সংকেতে জানায়। এ-কথা কাউকে বলার জো নেই, বুড়ো দরোয়ান জানতে পারলে কাকার কান ধ'রে নামিয়ে আনবে, আর কখনো কি উঠতে দেবে?

সে বাবার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যে-ই সরকারী হাঁসপাতালের কাছাকাছি এসে পৌঁছয়, অম্‌নি কাকা কোথা হ'তে টুপ্ ক'রে এসে হাত ধরে। বাবা মনে করেন—তারণ এইমাত্র খেলা শেষ ক'রে স্কুল থেকেই এল। ছবির এত হাসি পায়!—ভারি ইচ্ছা করে একবার জোরে হেসে নেয়, কিন্তু তার উপায় নেই—বাড়ি পৌঁছে কাকা ওর কানটা এমন ম'লে দেবে!—অগত্যা কাপড়ের পুঁটুলিটি বুকে চেপে ধ'রে পরম গম্ভীর মুখে পথ চলতে থাকে। মাঝে মাঝে বাবার পিছন পিছন এখানে ওখানে থামে, কাবুলিওয়ালার দোকান থেকে ফল, বাদাম—রাধুর স্টল থেকে বিস্কুট, চকোলেট কিনে নিয়ে লালদীঘি ঘুরে, ফকির-সাহেবের পাহাড় পার হ'য়ে বাড়ি ফেরা।—

সপ্তাহের এই দুটি দিন বড় সুখে কাটে। দুপুরে বাড়িতে কেউ থাকে না। যে বুড়ো চাকরের উপর ওদের দেখাশুনার ভার দিয়ে মহিম কাজে চ'লে যান, সে অচিরেই বারান্দায় আরামে নাসিকাধ্বনি করে। তখন দুজনে পা টিপে টিপে নিচে নেমে যায়। বাড়ির পিছনেই যে নালাটা নদী থেকে বরাবর বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে সহরের ভিতর অনেকদূর চ'লে গেছে, তাতে জোয়ারের সময় নদীর জল ঢুকে ফুলে কাঠের কারখানার বড় বড় চেলা-কাঠগুলোকে সারি সারি ওপরে ভাসিয়ে তোলে। তাদেরই মস্ত একখানাকে ডিঙির মতন ভেবে নিয়ে তারণ ছবিকে নিয়ে চেপে বসে। পড়বার ভয় নেই, ভেসেও যায় না—কারণ কাঠগুলো সবই মোটা মোটা দড়ি দিয়ে কারখানার খুঁটির সঙ্গে দিনরাত বাঁধা থাকে। যেদিন নদীতে ভাঁটা, সেদিন নালায় একফোঁটা জলও থাকে না। রোদের তাপে চেনা-অচেনা নানান্ মাছ আর মৎস্য-শিশুরা ধড়ফড় ধড়ফড় ক'রে ঠাণ্ডা কাদার বুক খুঁড়ে একেবারে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করে। তারণ কাঠের ওপর চুপটি ক'রে ব'সে নিবিষ্টমনে চেয়ে থাকে, যে-ই মাছ নড়তে দেখে অম্‌নি একতাল কাদা তুলে ছবির সাম্‌নে ফেলে

দেয় —সে তা আঙুল দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে মাছ উঠল কি না দেখে। কোনো কোনোদিন আবার তারণ মাটি খুঁড়ে কেঁচো নিয়ে আসে। একটা লাঠির আগায় সরু সুতো বেঁধে, সেই সূতায় কেঁচো বেঁধে মাছ ধরতে যায়। ছবির কিন্তু এ-খেলাটির উপর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা, ছোটকাকার ভয়েও সে কেঁচো ধরতে রাজি নয়। কোনোমতে একবার ছোঁয়া গেলে ঘ'সে ঘ'সে হাজার হাত ধোও—মনে হবে যেন হাতে লেগে রয়েছে। রাত্রে খাবার সময় কাকার হাতের দিকে তাকিয়ে গা-কেমন করে।

আর একদিন খাওয়াদাওয়ার পর শম্ভু তেমনি নাক ডাকাচ্ছে। তারণ বললে, 'আয়রে ছবি, একটা মজা দেখবি আয়।' শম্ভুর পাশেই মাদুরের ওপর কাগজে জড়ানো গোটাকয়েক বিড়ি আর দেশলাইয়ের বাক্স রোজই থাকে। একটা বিড়ি আর দেশলাই নিয়ে দুজনে নালাতে নেমে পাশাপাশি বসলে। তারণ বিড়ি মুখে দিয়ে বলল—'ধরিয়ে দে।' অনেকগুলো কাঠি খরচের পর অনেক কষ্টে বিড়িটা জ্বালানো হ'লে তারণ একটানে অনেকখানি ধোঁয়া বের ক'রে দেখালে। ছবি হাত পেতে বললে—'এবার আমায় দাও।'

—'না, তুই পারবিনে, পুড়ে যাবি।'

সে জেদ ক'রে বললে, 'না, দাও—খুব পারব, দেখো তুমি।' ততক্ষণে বিড়ির পাতা পুড়ে শেষ হ'য়ে তামাক পুড়তে আরম্ভ করেছে। ছবি জোরে টান দিতে না দিতেই —ইস্, দুনিয়াটা যেন চোখের উপর ঘুরছে, গাছপালা, নদী-নালা, সামনে ও-ই গরুটা —ছোটকাকা—ছবি সেখানেই শুয়ে পড়ল : একটু আগেই ভাত খেয়েছিল, তার কিছুই আর জঠরস্থ রইল না। তারপর থেকে সে তামাকের গন্ধও সহ্য করতে পারে না।

এ-সব ক্রীড়া-কৌতুকের কথা কিন্তু মহিমের কানে গেলে বড় মুস্কিল বাধে : তার পরের হপ্তায় ছবিকে আর বাড়িই আনা হয় না। তাই খুব সাবধানে সব সারতে হয়। ও কতরকম ক'রে ব'লে দেখেছে, কিন্তু বাবার যে কেমন জেদ—কিছুতেই তাকে কাকার সাথে একসঙ্গে বাড়িতে রাখবেন না—বোর্ডিংএ ওর কত কষ্ট হয়—তবু না।

প্রথম বছর গরমের ছুটিতে দুজনে একসঙ্গে বাড়ি এসেছে। তারণকে পুকুরের জল আর গাছের ডালে ছাড়া অন্যত্র কোথাও খুঁজেই পাওয়া যায় না। কাঁঠাল পেড়ে গাছে ব'সে ভেঙে গাছেই খেয়ে আসে। ছবি অতটা পারে না, গাছে উঠে নিচের দিকে তাকালে মাথাটা ওর কেমন করে, পায়ের তলায় কে যেন সুড়সুড়ি দেয়। ওর চুলগুলো এরই মধ্যে বেশ লম্বা হয়েছে, ভিজলে আর শীগগির শুকোতে চায় না। বাড়ির ভিতরদিকটায় পা দিতেই ঠাকুরমা ধ'রে ফেললেন—'আবার ডুব দিয়ে এসেছ? এই অবেলায় চান ক'রে এলেন মেয়ে—কোনদিন ডুবে মরবেন—ব'লে দিলাম, লিখে রাখো'—কথাটা মা-র কানে গেলে কিন্তু অত সহজে নিস্তার নেই।—অনেক ভেবে তারণ একটা ফন্দি এঁটে ছবিকে বললে। সে তো আহ্লাদে চৌষট্টিখানা!...

পরদিন দুপুরে ভাত খেতে এলে মা খানিকক্ষণ আর কথা বলতে পারলেন না। পরে

কানটি ধ'রে দালানে বাবার সামনে এনে—'নাও সামলাও তোমার মেয়েকে তুমি, আমি তো আর পারি না। দেখ একবার—'

বাবা মুখ তুলে চেয়ে দেখেই হেসে উঠলেন : 'যাক্ গে, আপদ গেছে। ছেড়ে দাও, চুল তো দুদিনেই গজাবে আবার!'—

কিন্তু কথায় বলে, চিরদিন কারো সমান যায় না। এ-হেন মেয়েও ক্রমে বোর্ডিং-বাসে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর চাইতে লেখাপড়ায় ওর আগ্রহ বাড়ে —ফি বৎসর ক্লাসের ফার্ষ্ট প্রাইজটি পাওয়া চাইই। স্বভাবও অনেকটা শান্ত সংযত হ'য়ে এসেছে ; এখন দেখলে সেই রুক্ষ্ম মাথা, আধো-শাড়ী আধো-ধুতি ক'রে অভিনব ধরণে কাপড়-পরা দুর্দ্দান্ত মেয়েটিকে ওর মধ্যে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। ছুটিতে গ্রামে এলে বাড়ি-বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে বেড়াতে ওর অর্দ্ধেকটা দিন কেটে যায়।

তারণের কিন্তু পড়াশুনার চাইতে ড্রইংএ আর ছবি আঁকতে ঝোঁক বেশি। দেখে অপূর্ব্ব ঠিক করেছে ওকে কলকাতায় আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবে। স্কুলের সে সেরা খেলোয়াড়—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি-খেলায় একেবারে বিক্রমসিংহ। ছুটির দিনগুলো সাঁতার কেটে, গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে মাঠে মাঠে খেলে বেড়ায়। খুব রোদ থাকে ব'লে দুপুরে বাইরে যেতে পারে না—সে-সময়টা ব'সে ব'সে ছবি আঁকে। শিশু ছবিকে সেই দোল দেওয়ার সময়কার ম'ত শুধু এ-সময়টা সে আশ্চর্য্যরকম শান্ত।

ছবি মনে করে ওর ছোটকাকার মত ছবি তিনভুবনে কেউ কখনো আঁকেনি—আঁকতে পারবেও না। সে যাকে তাকে বলবে,—বিনা সাহায্যে এত অল্প বয়সে এমন প্রতিভা ক'জনের দেখা যায়?—সময় পেলেই ব'সে ব'সে একমনে কাকার ছবি-আঁকা দেখে আর ছোট-ঠাকুরমার কাছে গিয়ে গর্ব্বে, স্নেহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কাকার মুখের আদল কতখানি সে নিয়ে গভীর গবেষণা করা চাই। তখনকার দিনে বিদ্যাসাগরের থেকে বড় আদর্শ ছবি কল্পনাও করতে পারত না।

দিনগুলো এমনি শান্তি আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে, এমন সময় এক অঘটন ঘটল।

একদিন গ্রামের দক্ষিণ-দিকের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে তারণের সঙ্গে ও-পাড়ার রহিম সর্দ্দারের ছেলে কাদেরের বাধল বিষম ঝগড়া! তারণের দল ছিল ভারি, তাই কাদের সেদিন কিছুই করতে পারলে না। কিন্তু মনে রেখে দিল।

দিন কয়েক পরে—খবর পেয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ি থেকে লোক গিয়ে মাঠের আলের উপর তারণকে অজ্ঞান অবস্থায় পেল। তারপর কিছুদিন জ্বর, প্রলাপ—যমে-মানুষে টানাটানি। এযাত্রা বেঁচে উঠল বটে, কিন্তু এত দুর্ব্বল যে, ছুটির পরে সেবার আর স্কুলে ফিরতে পারলে না।

এর পর থেকে তারণের একটা-না-একটা অসুখ লেগেই থাকে। শরীরের সেই নিটোল পরিপুষ্টতা ঝ'রে গিয়ে দিন দিনই রোগা আর বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে...অবশেষে ভালো ডাক্তার ডেকে পরীক্ষা করানো হ'ল : আর সন্দেহ রইল না। তারণের জন্মের বছরখানেক

পরেই নাকি ওর বাবা যক্ষ্মারোগে মারা যান! সকলের বড় বোনটিরও একই রোগে বিদেশে মৃত্যু হয়। মহিমকে বাধ্য হ'য়ে তারণের পড়াশুনা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল।

ছবি কিন্তু আসল ব্যাপারের কিছুই জানল না! দেশে এ-সব রোগের কথা কেউ কাউকে বলে না, যতদূর সাধ্য গোপন ক'রে রাখে—বিশেষত 'ছেলেমানুষ'দের কাছ থেকে। ওকে শুধু প্রবোধ দেওয়া হ'ল, কাকার বড় বেশি জ্বর হচ্ছে, তাই এখন ঠাকুরমার কাছে থাকবে—সেরে উঠলে একেবারে কলকাতায় যাবে।

মহিমের সংসারে এখন অনেক পরিবর্ত্তন। তাঁর মা মারা যাওয়ার পরে অপূর্ব্বর বিয়ে দিয়ে নতুন-বৌকে খুড়িমার সঙ্গী-হিসেবে রেখে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি আজকাল সহরের বাড়িতেই থাকেন। কালে-ভদ্রে পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে আসেন গ্রামে। অপূর্ব্ব চাকরি করে দূর বিদেশে।

ছবি ওরফে আরতি এখন কলকাতায় কলেজে পড়ে। মা বাবা সহরেই থাকায় সে ছুটিতে আর গ্রামে আসতে পায় না। তাছাড়া এত বড় মেয়ের এখনো বিয়ে না হওয়ায় —বা মহিম জেদ ক'রে না দেওয়ায়—গ্রামে এলেই রকমারি অপ্রীতিকর আলোচনা হয়। আসতে না দেবার সে-ও একটা কারণ। তাই ও আস্তে আস্তে দেশের বাড়ির কথা ভুলতে আরম্ভ করেছে। সেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, ছোটকাকার চেলা হ'য়ে যতরকম অনাসৃষ্টি দৌরাত্ম্য—সে-সব কদাচিৎ কখনো মনে পড়লে হাসি পায়, লজ্জাও করে। ওর সামনে এখন নতুন জীবন, নতুন আশা, কত নব নব সমস্যা... ভিতর বাইরের দ্রুত উজ্জ্বল পরিবর্ত্তন। পড়াশুনার ফাঁকে যে স্বল্প সময়টুকু হাতে পাওয়া যায়, তা মিস দত্ত, মিস রাহা, চারু, লতাদি, ফুল, পিণ্টু প্রভৃতি কত বান্ধবী, সখী ও পূজার্হাদের দিয়ে ভরাট। ওর অবসর কোথায় যে অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে প'ড়ে থাকবে? শুধু রবিবারের অলস মধ্যাহ্নে আর মাঝে মাঝে বাবাকে চিঠি লেখার সময় ছোটকাকার কথা মনে ভেসে আসে খোলা সাগরতীরে দমকা হাওয়ার মত।

প্রথম প্রথম তারণ মনে করত ছবি গরমের ছুটিতে না এলেও অন্তত পুজোর ছুটিতে আসবেই। কিন্তু আজ দু'বছরের ওপর হ'তে চলল—সে আর বাড়িমুখোই হয় না। মার কাছে শুনেছে আসতে দেওয়া হয় না। এমনটা যে হবে তারণ স্বপ্নেও ভাবেনি। ওর দিন যেন আর কাটতে চায় না। এই রোগে তো কেউ হঠাৎ মরে না, এ যে তিল তিল ক'রে জীবনের রস নেয় শুষে—রস-নিংড়ানো ইক্ষুর মত শেষে একদিন নিষ্প্রাণ খোলসখানি থাকে প'ড়ে। সে ভাবে—ছবিই বা কেন জোর ক'রে আসে না, হ'লই বা একটু নিন্দা, বললেই বা পাড়ার লোকে দুটো কথা! এলে ওকে দিয়ে বড়দাকে বলাতে পারত—কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যেতে। ওখানে গেলে নিশ্চয় ভালো হ'য়ে যাবে—এখানে কবিরাজের ওষুধ কত খাবে আর? বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তার জন্যে টাকা চাই—কোথায় পাবে?—আঃ, এখন কলকাতায় অসহযোগের মাতামাতি—এই দূর পল্লীতেও তার ঢেউ এসে প্রাণে লাগে। জোলা তাঁতির দর বেড়ে যাচ্ছে বৈকি ; তারণ ভুলেও আর বিলিতি কাপড় কেনে না। ওর ভারি ইচ্ছা

করে, সমবয়সী ছেলেদের মত সেও দেশের কাজ ক'রে বেড়ায়। কিন্তু—দেশের কাজ মানে কি?—ছবি এলে জিজ্ঞেসা করত ও কী বলে, ওর মত কী? আশ্চর্য্য যে, এত গোলমালেও সে এখনও কলেজ বয়কট্ করেনি, কাগজে তো কত মেয়েদের নাম দেখেছে।—দিনগুলো যেন ওর বুকের ব্যথাটার মতই ভারি—একমিনিট হালকা হ'য়ে ওকে একটু স্বস্তি দেয় না। এমন জীবন্মৃত হ'য়ে আরো কতদিন থাকতে হবে কে জানে?—

কলেজে সেদিন কিসের ছুটি। সামনেই একটা পরীক্ষা, তাই বোর্ডিংএর মেয়েরা এখানে-সেখানে যে-যার মনোমত জায়গায় বই হাতে তন্ময়। ছুটির দিনে আরতির পড়াশুনো একটুও ভালো লাগে না—পরীক্ষাকে মনে হয় একটা অনাবশ্যক উপদ্রব ব'লে। কলেজের বাড়ির পিছনের গ্রাউণ্ডে একটা পুরোণো ম'জে-যাওয়া পুকুর—চার পাড়েই তার অনেক কালের বড় বড় গাছ। অমন চমৎকার সবুজ 'লন', ফুল আর পাতাবাহারের বাহার ফেলে অবাধ্য মন তাব কেবলই সেই পুকুরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির বিস্রস্ত বেশের মধ্যে ওর প্রাণটা নিতান্ত ছাড়া পায়। পুকুরের ঘন শৈবাল, ফাঁকে ফাঁকে জলের মধ্যে দু-একটি কুমুদ কহ্লার, পাড়ের ধারে হিঞ্চে ও কলমীশাক, ছোট ছোট বন-কচুর ঝোপ, ঘাস-গুল্মের সাদা, বেগুনি ও নীলরঙের রকমারি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল ওর আবাল্য-পরিচিত গ্রামখানির পথ-ঘাট, পুকুরের কথা মনে করিয়ে দেয়! কিন্তু এ-সবের মধ্যে এত কী দেখবার আছে সঙ্গী মেয়েরা বুঝতে পারে না—ঠাট্টা ক'রে বলে—'আরতি আম জাম আর কাঁচা তেঁতুলের লোভে ওখানে যায়—দৈবাৎ এক আধটা প'ড়ে আছে কি না দেখতে।' প্রিন্সিপালও ওর এই বুনো জায়গার প্রতি প্রীতি লক্ষ্য করেছিলেন। তবে তিনি ভাবতেন—'ভালোই, একলা ব'সে পড়াশুনো করতে চায় তো করুক।' কিন্তু বই-হাতে গেলেই যে পড়তে যাওয়া না হ'তে পারে. ভালোমানুষ মেমের সে সন্দেহ হয়নি। আরতি অধিকাংশ সময়ই কবেকার-বাঁধানো জীর্ণ ঘাটখানির জলের সবচেয়ে কাছের ধাপে ব'সে থাকে। পড়তে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু এখানে এলেই কী এক উদাস-ভাব ওকে কেবলই অন্যমনস্ক ক'রে দেয়। কলেজ ও তার সংলগ্ন স্কুল-বাড়ি ছুটির দিনে নিস্তব্ধ নিঝুম প'ড়ে—যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরী, তরুণ-প্রাণের সোনার কাঠির স্পর্শে জাগন্ত মুহূর্ত্তের পথ চেয়ে!...আর, এই বন-বাদাড়, শুকনো পাতার রাশি, পুকুরের সবুজ শ্যাওলা, তারি উপর এক-এক-সময় কোথা-হ'তে-উড়ে-এসে-বসা ছোট্ট অচিন ঐ পাখিটা...এ-সবে যেন কী জাদু আছে। ওর মনে হয় জন্ম জন্ম এম্‌নি কোন্ আবেষ্টনীর মধ্যে ছিল সে—ঋষি-বালিকার মত। ও-ই মহানগরীর সভ্য সৌধমালা এবং তাদের অভ্যন্তরে আজকের সুসভ্য মানবের শত শৃঙ্খলাসজ্জিত কক্ষের পর কক্ষ, বিলাস-প্রকরণ, অতি সতর্ক জীবন-যাত্রা, সব ওর নিতান্ত অপরিচিত অর্থহীন মনে হয়। ও-সবের কিছুই যেন আরতির প্রকৃত আপন নয়, ভালো থাকে সে অনাবৃতা প্রকৃতি-মাতার মৌন-ভাষাময়ী শান্তির মধ্যে—রুক্ষ্মা ধরণীর নীরব কোলে।—তবু—

—'কি লো আরতি, এত কী কবিত্ব করা হচ্ছে হাঁ ক'রে ঐ পচা পানার দিকে তাকিয়ে? ডাকলে সাড়াই নেই—এই নে, তোর চিঠি।—বাবা, কী পছন্দ মেয়ের—ঘরে

ব'সে পড়া তৈরি করবেন?—শ্রীমতী আরতি দেবী—বি-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট?'

আরতি হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে—'বেশ চুপচাপ জায়গাটা লতাদি, ভারি ভালো লাগে আমার—'

—'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা, চললুম এখন—আমার আবার ঢের কাজ প'ড়ে। মিস্ দত্ত ডেকে বললেন চিঠিখানা তোকে দিতে—তাছাড়া তোর তপস্যাটিও একবার স্বচক্ষে দেখে যাবার মত বৈকি। কেবল—বল্ না ভাই চুপি চুপি—গালে হাত দিয়ে তুই এত কার তপস্যা করছিলি, কে—ও কি রে?'

আরতি ধপ্ ক'রে ঘাটে ব'সে পড়েছে। লতিকা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে—'কী হ'ল? কোনো খারাপ খবর না কি?' তাড়াতাড়ি চিঠিখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে পড়লে...'ছবি, তুমি নিশ্চয় একবার বাড়ি এসো। আমার শরীর গেছে ভেঙে। অসুখ থাইসিস—এদেশে যার চিকিৎসা নেই। লোকে কাণা-ঘুষো করে আমি নাকি আর বেশিদিন বাঁচব না। মোটে একুশ বছর বয়স আমার, জীবনে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা—বাঁচতে আমার কী ভয়ানক সাধ—কেন আমি মরব? ভগবানের কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো আরতি। বড়দাকে বোলো কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যে টাকা পাঠাতে—এমন ক'রে মরতে দেবে আমায়? ইতি তোমার ছোট্কা।'

পরদিন বাড়ি থেকে ওর টেলিগ্রামের জবাব এলো—'তারণের অসুখ শক্ত বটে, কিন্তু এক্ষুনি কোনো ভয় নেই। তুমি পরীক্ষাটা দিয়েই এসো।'

জন্মাবধি খেলার সাথী, বাল্যের বন্ধু, মা-বাপের একমাত্র সন্তান, আরতির ভাইয়ের বাড়া—সে আজ মৃত্যুশয্যায়—তবু ওকে দিতে হবে পরীক্ষা, থাকতে হবে অপেক্ষা ক'রে সময়ের জন্যে! কী যে পরীক্ষা দিল তা ও-ই জানে। কোনোমতে শেষ ক'রে—সহরে রওনা হ'ল। মনে মনে কত ভাবনা—কি জানি বেঁচে আছে কি না, একবার শেষ দেখাও হ'বে কি না। কতদিনের পর! নাঃ—এমন হ'তেই পারে না, মৃত্যু কি এতই সহজ? ভগবান কি নেই?—জোর ক'রে যত কু-ভাবনা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

রাত্রে ট্রেনে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখে—ছোটকাকা সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। আরতি রাগ ক'রে বলে—যাও, তোমার কোনো অসুখ হয়নি। মিথ্যে আমাকে ভয় দেখিয়ে—কিন্তু এ কী! কাকার চোখদুটি কী অদ্ভুত বিষণ্ণ! আরতির মুখের উপর ওর সেই বড় বড় চোখের ক্লান্ত-করুণ দৃষ্টি রেখে কি যেন বলতে গেল—একটা কি শব্দে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে আরতি দেখে কেউ কোথাও নেই। পাশের বেঞ্চিতে ওর পথের সঙ্গী বউটি তার খোকাকে বুকের কাছে সন্তর্পণে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে। একবার মনে হ'ল ডাকে, কিন্তু কি ভেবে চুপ ক'রে ব'সে রইল। সে রাতে ওর চোখে ঘুম আর এলো না।

সকালে ষ্টেশনে চিরদিনের প্রথামত দরোয়ানই নিতে এসেছে। ভয়ে আরতি ওকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারল না...পাছে কি শুনতে কি শোনে।

গেটের কাছে গাড়ি এসে থামতেই দেশের বাড়ির সরকার বেরিয়ে এলো। 'প্রসাদ-দা, আপনি যে এখানে? বাবা কই?'

—'এস দিদি, ভেতরে এসো। ওঁরা বাড়ি গেছেন, আমি কাল সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি—তোমায় নিয়ে যাবো এই জোয়ারেই। মুখে হাতে জল—'

—'এই জোয়ারেই? কেন?—' আরতি আর বলতে পারে না, স্বপ্নের কথা মনে হ'ল—জিভ শুকিয়ে তালুতে যেন আটকে গেছে!

—'মুখ হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হও—সারারাত গাড়ীর কষ্ট—রাত্রে কিছু খাওনি বোধ-হয়—'

—'না, কিন্তু বলুন আপনি—'

—'বলছি দিদি, বলছি—এত ব্যস্ত হয় না—'

—'না, এক্ষুনি বলুন—'

সরকার একটু চুপ ক'রে থেকে ওর পিঠে হাত রেখে বললে—'বলবার আর আছে কী দিদি? না, ছি, ছেলেমানুষি করে না, ছি, ছি, কাঁদে না—দিদি, ওঠো। ওর কি আর প্রমায়ু ছিল—ছেলেবেলা হ'তে দেখছি তো? পৈতৃক রোগ—আর যে কাল-রোগ।'

নৌকায় উঠে আরতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—'কখন্?'

সরকার চম্‌কে বললে—'কি—কখন্?—ওঃ, পরশু ভোর রাতে। তা দিদি, এলেই যদি—আর দুটো দিন আগে এলেই চোখের দেখাটা পেত—বাক্‌রোধ হবার আগে পর্য্যন্ত কেবল তোর কথা—"ছবি এলো, মা? এখনো এলো না সে"—না, অমন করলে তো আমি বলব না—'

ছোট্‌কার জীবনের শৈশবে তাকে দেখে কত লোকে কত কথাই বলেছে...আরতি ভাবে...কত আন্দাজই করেছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে...কত ভাঙা-গড়া...কত জল্পনা-কল্পনা. . .

অ
ন্যা
ন্য

হৃদয়ের রঙ
সোনালি

হৃদয়ের রঙ

সকালবেলা। উঠতে আমার দেরি হয়েছে। মেয়েটি নাকি আজও অনেকক্ষণ বসেছিল, তারপর চলে গেছে। বলে গিয়েছে, পরদিন আবার আসব।

পরের দিন ও সত্যিই এলো। মনে মনে বিরক্ত হলাম, চেনা নেই শোনা নেই, এরকম ধর্ণা দেওয়া কিসের জন্য?

বিরক্ত হয়েই দেখা করলাম। দেখলাম শ্যামল সপ্রতিভ মুখে ক্ষমাভিখারী দুটি চোখ। লজ্জিত হয়ে বললাম, 'বসুন।'

বসল না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

শুধালাম, 'কি দরকার আপনার? কাকে চান?'

'আপনাকেই।'

মধুর কণ্ঠ, শুনে মনটা আরও নরম হল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'চিনি বই কি।' একবার ইতস্তত করল, তারপর হঠাৎ সরে এসে সামনে নতজানু হয়ে বললে, 'কী সুন্দর আপনি! ভালো করে দেখব, অনুমতি দিন।' তুলে ধরল ওর চোখ—আশ্চর্য চোখ।

আমি সুন্দর? মেয়েটি পাগল নাকি! বিচলিত হলাম, 'ওকি করছেন? উঠুন, উঠে বসুন!'

'অপরিচিতা আমি...'

'বলুন না কী বলতে চান।'

'সব কথাই বলতে পারি তো?'

হাসলাম, 'অনুমতির দরকার আছে?'

বলল, 'আছে। বিনা অনুমতিতে দেখা করতে আসা এক, কথা বলা অন্য ব্যাপার। আমার যে অনেক আছে বলবার।'

ভেবে দেখলাম শোনা উচিত। লেখকের কল্পনার প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর, অতএব মননের আগে শ্রবণকে প্রশ্রয় দিতে দোষ কি।

মেয়েটি যেন বুঝতে পারল, বললে, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে নিঃসংকোচ হওয়া ভালো। গোড়া থেকেই সুরু করি। ধরুন নামটি আমার অণিমা। কেন এসেছি? আমি কি জানি না লেখকের কাছে কথা বলতে আসা কী বিপদ! বলব এক, মনে মনে গড়ে তুলবেন অন্য বস্তু। সব জেনেই এসেছি। আমি যে শোনাতে চাই।'

উৎসুক হলাম, এমন কী কথা। না, আগে বরং ও-ঘরেই যাওয়া যাক, এখানে এসে পড়বে কেউ।

অন্য ঘরে এলাম অণিমাকে নিয়ে। এদিকে দৃশ্য সুন্দরতর, আকাশের অনেকখানি আমার!

অণিমা বলল, 'ঘরটা দেখছি রাস্তার উপর। আপনি জনতা ভালোবাসেন?'

'বাসিনে? জনতা নিয়েই তো আমার কাজ।'

'কিন্তু আকাশকে নিয়ে আপনার কল্পনা। সেজন্যেই আসতে সাহস পেয়েছি।' বলে অণিমা নতমুখে কী ভাবল, চোখের সামনে খুলে ধরল হাত দু'খানি। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম হাতে একটা আঙটি, বাম হাতের অনামিকায়। রক্তরাঙা পাথরখানি, সোনার বুকে যেন হৃদয়ের একফোঁটা রক্ত।

সেদিকে চোখ রেখে অণিমা ধীরে ধীরে বলল, 'বয়স আমার খুব বেশি নয়। কত আন্দাজ করেছেন? এই আপনারই বয়সী তো? হবে। কিন্তু এরই মধ্যে কত দেশ ঘুরেছি। বিদেশী আকাশের আর বিদেশের জনতার, খানিকটা হাওয়া আর ঢেউ, এখনো লেগে রয়েছে গায়ে। অনেক গল্পই শোনাতে পারতাম। হয়ত আর একদিন। আজকে শুনুন আমার নিজেরই গল্প। বলেছি না, প্রকাশের তাগিদে আপনার কাছে আসা? যাক্, শুনুন। সংক্ষেপেই সারব।

•

বছর কয়েক আগে। সমুদ্রে ভাসছিল আমাদের জাহাজ। ছিলাম ভেনিসে, জাহাজ ছাড়বার অপেক্ষায়। দিন কয়েক পরেই নিরুদ্বেগে পাড়ি দেব অকূলে। কিন্তু অদৃষ্ট! সঙ্গে পরিচিত যারা ছিল, প্রতাপ তাদের একজন। দেখতে কেমন?...বলব না। কল্পনা করে নিন।

একদিন অসময়ে অকারণে, বিনা ভূমিকায়, ওই প্রতাপই আমাকে বললে, 'শুধু এটুকু পথের নয়, অণিমা, আমার জীবনের অনন্ত পথেরও সঙ্গিনী তুমিই।'

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, শুনে আমি সেদিন খুসি হতে পারিনি। প্রতাপকে অনেক দেখেছি, এভাবে তো কখনো দেখিনি। অকস্মাৎ প্রিয়তম হয়ে বসবে, একি সম্ভব? প্রেম এরকম হঠাৎ পাওয়ার বস্তু নয়। আমি তো জানি, রসরচনার মতো ভালোবাসাকে আগে আপন অন্তরের রসে রচনা করতে হবে, পরে আসবে তার দান।

এই ব্যক্তি আমাকে এত সহজলভ্যা মনে করল কেন? ভাবছি!...প্রতাপ বললে, 'কী ভাবছ? ভাবো। হয়ত এখনো তেমন ভালোবাস না আমায়, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, বাসতেই হবে।'

প্রেম সম্বন্ধে যত কল্পনা ছিল, কোনোটাই মিলল না, এই পুরুষের উক্তির সঙ্গে। বড় রাগ হল। বললাম, 'বেআদবের কাছে ভালোবাসার পাঠ নেবো না। জীবনসঙ্গিনী হওয়া দূরে থাক, পথের সঙ্গিনীও হতে আপত্তি আছে।'

কিন্তু বার্থ যে রিজার্ভ করা! প্রতিজ্ঞা রাখতে বিপদে পড়লাম। প্রতাপ দয়া করে বলল সে নিজেই এক ষ্টিমার পরে আসবে।

বললাম, 'তা হবে না, কেবল অকারণ নাটকটাই বাদ দিতে হবে।'

তারপর থেকে দেখলাম প্রতাপ এক নতুন মানুষ। কিংবা হয়ত আমার দৃষ্টিই গিয়েছে বদ্‌লে। পরিবর্তনের শক্তি মানুষের ভিতরে যে অসীম। কখন, কার কী কথায়, কোন পরশে, অন্তরের জানা লোকটির অজানা বিবর্তন হবে, বলা কঠিন। আমার চোখে এবার প্রতাপের নতুন রূপ প্রকাশ পেলো। নিতান্ত সাধারণ বলেই জানতাম ওকে। কিন্তু আজ, ও যে আমায় ভালোবাসে! সংসারে এর চেয়ে অসাধারণ আর কী আছে? মমত্বের চেতনায় এক নতুন দরদ নিয়ে প্রতাপকে আমি এখন বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আমাদের চুক্তি অনুসারে প্রতাপ ষ্টীমারে দূরে থাকল। পরে বুঝলাম এখানেই হতে দিয়েছি ভুল। কাছে থাকলে লোকটি হয়ত মনের সামান্য কিছু স্থান জুড়ে থাকত। দূরে দূরে রইল বলে ওর চিন্তা, ও যে ভালোবাসে এই চিন্তা আমায় পেয়ে বসল। দেখলাম রাতে তারার ঝিলিক বুকে বেঁধে সাগর যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলে, উদয় ও অস্তে সূর্যের রঙ কী আশ্চর্য! এরকম আর কেউ কখনো দেখেনি, আমিই প্রথম দেখলাম! নানাভাবে আবিষ্কার করলাম ধরণীর অসীম সৌন্দর্য, আমার অন্তহীন অভিলাষ। আবিষ্কার করলাম আমি কবি—হলামই বা অবিকশিত, পৃথিবীর বুকের সব ফুলই কি ফোটে?

নিজেকে নেড়েচেড়ে আমি ছিলাম সুখে, ধাক্কা লাগল প্রতাপের পরিবর্তনে। আর একদিকের ডেক-এ বসে ও যে ঢেউ গণনা করে, হাতে বই ধরে থাকে বৃথাই, ডাকলে বিরক্ত হয়। রোগাও হয়েছে।

আমার ভিতরের নারী বুঝতে পারল সবই। প্রতাপের ও আমার, দুজনের জীবনে এখন দুই রঙ। নিজের চোখে আমি সার্থক, কেননা বিধাতার সৃষ্টিশিল্প আমার দ্বারা ব্যর্থ হয়নি—ওই পুরুষটিই তার প্রমাণ। কিন্তু সে কেন শক্তিহীন? কারণ ঈপ্সিতা নারী ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিয়েছে প্রাণ—দেয়নি ফিরিয়ে। আমার ব্যাঙ্কের খাতায় জমা, প্রতাপের হয়েছে খরচ।

বিবেকে বোঝাল এটা ভাল হচ্ছে না। অনুভব করলাম, রঙ ফিরিয়ে না দিলে রঙীন হওয়া অন্যায়। কিন্তু কি করি, কী দেবো ওকে? কী যে চায়, জানি ; ওই বর্বরতার কাছে কি হার মানব?

ভেবেছিলাম, ভালোবাসব আমি পুরুষের স্থিরশিখা বুদ্ধিকে। ওদের দুর্বার প্রতাপ কেন আমার আবেগের উপর বলপ্রয়োগ করল?

নিজের দুর্বলতায় ভীত হলাম। ওরা নিষ্ঠুরভাবে আমাদের আকর্ষণ করে, ওদের বাহাদুরি এইখানে। প্রিয়া নারীর কাছে ওদের দাবি তো শিশুর উৎপাতের মতন অবুঝ —এই উপদ্রব ভালোও লাগে, রাগও হয়। প্রতাপ নিজের চারদিকে যতই দুঃখের আবর্ত রচনা করতে লাগল, বুঝলাম এমনি করেই ও জোর করে কেড়ে নেবে, সৃষ্টি করবে আমার ভালোবাসাকে। দিনকয়েক এমনি বলপরীক্ষা চলল।

তারপর, একদিন—না, দিনে নয়, রাতে...হাজার নক্ষত্রদীপের নীচে, সমুদ্রের হৃদয়ে সরোজের মতন জাহাজখানি যখন জ্যোতির্ময় ও ভাসমান, কী যে আমি বলেছিলাম ওকে, মনে নেই, মনে পড়ে না ; মনে রয়েছে ওরই কথা, 'মিছে তোমার এত অনুযোগ। অণিমা, ধরো এই আঙটি নাও। যখনই দেখবে, মনে পড়বে আমার আত্মদান, পুরুষের দাবি নয়—সমর্পণ!'

পরিয়ে দিল, এক ফোঁটা রক্তের এই মণিটি। সিঁদুরের সেই চিরন্তনী লেখা নয়, এঁকে রেখে গেল না প্রিয়তমের চিরন্তন অধিকার। তবু, রত্নের এই ফুলটি, যাকে জড়িয়ে ধরেছে সোনার বেড়ি, যার অঙ্গীকার...!

অণিমা হঠাৎ নিস্তব্ধ হল। মনে হল সাবধানে সযত্নে একটা নিশ্বাস গোপন করে ফেলল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ। বিস্মিত হলাম।

আরো একটু পরে বললাম, 'কথা কি শেষ হয়েছে?'

'শেষ? কি করে বলব! আগে জানতে হবে মনের জগতে এর কী অর্থ। সিঁদুর নয়, তবু কেন আমার ললাটে রইল এই দাগ? প্রতাপ আজ কোথায়, কতদূরে! আমি ওর কে! কেউ না।...তবু ওর দান নিজেই এসে ফিরিয়ে না নিলে, আমি তো তার অমর্যাদা করতে পারছি না—আমার মুক্তি কোথায়?...এ-কথা বলবেন ওকে, তাই আপনার কাছে এসেছি...'

তড়িতাহতের মতন ধাক্কা খেয়ে উঠলাম, তীব্র সুরে বললাম, 'কে—কে আপনি? একি অন্যায়! না, আর হেঁয়ালি নয়, দিন পরিচয়!'

'পরিচয়? একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ—আমি বুদ্ধি, আপনি হৃদয়। আমি চেয়েছি ওর আত্মদান, আপনি দিয়েছেন তৃষ্ণার জল। আর কত পরিচয় চাই?...হ্যাঁ, আরো একটু আছে, শুনুন। বোম্বাইতে প্রতাপকে শপথ করতে হয়েছিল আমার স্বাধীনতা সে হরণ করবে না, এই সর্তে আঙটি আমি রাখব। ওর মুখের দিকে সে সময় চেয়ে দেখেছিলাম, কী বিবর্ণ দেখালো মুখখানি। কিন্তু আমি যে তখন উচ্চ জীবনের সন্ধানী —পুরুষের বন্ধনে নীড়ে বন্দিনী হতে নারাজ।...তারপর কতদিন গেল, কত পথে ঘুরলাম, প্রতাপ এসে ফিরে গেল বার বার—ফিরিয়ে দিলাম ওকে। আঘাত দিয়েছি, দিতে পারিনি এই মণিটুকু —ওর এই আঙটি। বলুন তো, কেন তবু বুঝলাম না? ফিরে এলাম আবার কলকাতায় ; কাজে মন লাগে না, ভেসে যায় ভেনিসে, সাগরে, সেই চোখে সেই মুখে। মনে হল ডাকি : সামান্য সাধারণ মানুষ প্রতাপ, সঙ্গে তার সামান্যা সাধারণ মানবীই হই। কেন ইতস্তত করতে সময় গেল? কেন বুঝলাম না? এদিকে জগৎ যে গেল বদ্‌লে, সে দোষ কার?'

অবাক হয়েছি, উত্তর দেবো কী!

একটু পরে মধুর কণ্ঠ আবার বললে, 'বলবেন ওকে...আপনার স্বামীকে বলবেন, পরিবর্তনে বারবার আবর্তিত হবে পৃথিবীর সকল ছন্দ, বদ্‌লে যাবে সব রঙ, শুধু শোণিতের ছন্দ হৃদয়ের রঙই বদলাবে না কখনো। বলবেন, এ-কথা আমি বাস্তবিক কোনোদিনই ভুলিনি। ভুল হয়েছিল শুধু ওকে "না" বলা।'

কি জানি কতক্ষণ ছিলাম অন্যমনস্ক, ঈষৎ শব্দে যখন সজাগ হলাম, দেখলাম ধীরে চলে যাচ্ছে অণিমা। ডাকব কি?

ছুটে গিয়েও কিন্তু ডাকলাম না আর, মনে পড়ল আমার কথা শুনতে সে আসেনি —এটুকু গোড়াতেই বলে রেখেছিল।

পরিচয়, চৈত্র ১৩৪৯

সোনালি

সবে চৌদ্দ পেরিয়ে পনর'য় ফুটে উঠেছি। যাদুমাখানো দিন। সে যেন কোন্ এক জন্মের কথা। শঙ্খ উপত্যকা থেকে ছোট ছোট পানসী ভেসে এসে আমাদের ঘাটে লাগলো। কিন্তু কোনোটাই বাবার পছন্দ হলো না। আমরা শঙ্খনদীর কূলবিহারী, স্রোতের অবরুদ্ধ আবেগ চিনতে আমাদের দেরী হয় না। বুঝলাম, পানসীতে সহরে পৌঁছানো এই সময়ে অসম্ভব বলেই বাবা বড় নৌকার সন্ধান করছেন। রেলযাত্রা তখন শঙ্খকূলবাসীর অচিন্তিত। দুই অথবা তিন ঘাটে আমরা নৌকা ধরি—আমাদের গ্রামের পূবদিকে, দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমদিকে। সুতরাং এই গ্রামকে শঙ্খ তিনদিকে প্রদক্ষিণ ক'রে, চট্টল নগরের কাছাকাছি হঠাৎ কূলহারা কর্ণফুলীর উত্তাল আলিঙ্গনে ডুবে গেছে। সেই ঘণ্টাকয়েকের পথ—দুই নদনদীর আকূল প্রেমসঙ্গম স্মরণ করেই বাবা বড় নৌকা খুঁজছেন ; চিরাভ্যস্ত মাঝিরাও যেখানে 'আল্লাহ্! বিসমিল্লাহ্!' বলবার জন্য একবার নতজানু হয়ে বসে, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেবনির্ভরতার উদাস ভঙ্গিতে পুনরায় দাঁড় তুলে নেয় হাতে, সেই সাগরতুল্য উদ্দাম ঢেউ-আন্দোলনটা ছোট ডোঙাতে পার হওয়া? অসম্ভব। বিশেষত, আমার শিশু ভাইবোনদের নিয়ে মা এবার একাকিনীই যাচ্ছেন সহরে, সঙ্গে শুধু চাকর-দারোয়ান। বাবাকে কিছুদিন থাকতে হচ্ছে গ্রামে ; তাই তাঁর এই নিদারুণ উদ্বেগ বড় নৌকার জন্য, যে নৌকা একেবারে হেলবে না, দুলবে না—স্থির হয়ে থাকবে জলের উপর।

অবশেষে এলো সেটা। কিন্তু, নৌকা তো নয়—সুবৃহৎ একখানি বাড়ি, সচল প্রাসাদ। জলবিহারী ময়ূরপঙ্খী হলেই খুসি হতাম আমরা বড়-মেজ দুই ভাইবোন, কিন্তু উপায় নেই।

'ডলুর নৌকা তো? ওরে মাঝি, ডলুর ঢল—'

'আজ্ঞে কর্তা, নিশ্চিন্ত থাকুন। ডলুর ঢল কেন, শঙ্খ স্বয়ং পাহাড় ভেঙে নেমে এলেও আমার এই "গদু" পাহাড়েরই মতো ঢেউয়ের পিঠে চড়ে থাকবে!'

শুনে মনে হলো কর্তা সত্যই নিশ্চিন্ত হলেন। আমরাও ফুর্তিতে অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলাম, কেননা এই তিনদিনের যাত্রাপথে অভিভাবক একমাত্র মা। দুষ্টুমিতে নৌকা তোলপাড় হলেও সামান্য মৃদু তিরস্কারের বেশী শাস্তি তাঁর কাছে পাওনা হতেই পারে না। কে জানত যে শেষ মুহূর্তে সুহাসকাকাও নৌকায় উঠে বসবেন! কড়া মেজাজের কাকা, নববিবাহিতা বধূকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন শ্বশুরবাড়ি ; আমাদের সহরের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েই কর্ণফুলীর উর্দ্ধস্রোত-অভিসার ধরে তিনি যাবেন সেই সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ এক গ্রামে। রীতিমতো দ'মে গেলাম ভয়ে। তবু আমার আঁচল আর ছোট ভাই রবির পকেটদুটো ভারি হয়ে উঠল হালকা ইঁট আর পাথরের কুচিতে। নদীর বুকের উপর ছুঁড়ে মেরে কি আশ্চর্য খেলাই হবে তিনদিন!

সেই পূবের ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠলাম। বিস্তারিত তীব্রতা নিয়ে শঙ্খ এখানে অতি ভয়ানক। কারণ উৎপত্তিস্থান পর্বতমালা খুব বেশী দূরে নয়—মাত্র একটি দিনরাতের পথ। এ-কূল ভাঙছে, আর ওই কূল তাকে ডেকে নিচ্ছে আপন পরিপুষ্টির জন্য। ভাঙাকূলের

কুটীরবাসী সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে। ঝপ-ঝপ-ঝপাৎ—পায়ের নীচে মেদিনী ভেঙে পড়ে, পাতাল থেকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করে ঢং—ঢং—ঢং! সুহাসকাকা শিউরে ভীত কঠোর কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেন, 'ওহ! মাঝি, শুনছ? স'রে যাও, স'রে যাও, কূল থেকে আরো এক রশি দূরে সরে যাও।'

বাস্তবিকই, মাঝনদীতে দাঁড় ফেলে চলা ঢের বেশী নিরাপদ। সুউচ্চ পাড় থেকে ধ্বসে-পড়া মাটির নীচে প্রোথিত হবার ভয় নেই। কিন্তু কি ঢেউ! আঁচল থেকে ইঁটপাথর বের করা আর হলো না, রবিও পকেট চেপে বসে রইল। একদিন একরাত কেটে গেলো কেবল ডলুর ঢল পার হতেই। এইজন্যই এই ষ্টীমারতুল্য বড় নৌকাগুলিকে এদিকের লোকেরা বলে ডলুর নৌকা। ডলু শঙ্খের এক তীব্রতম অংশ—স্রোতধারায় তীব্র অবশ্য।

নৌকা একটুও হেলবে না দুলবে না—আদেশ ছিল মাঝির উপর। সেই আদেশ সে মেনে চললো শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় দিন এই স্রোতোজয়ী নৌকা সাধারণ শাখানদীতে এসে একেবারে অচল হবার লক্ষণ দেখালো। প্রমাণ হতে চললো যে, অভিজাত অনন্ত তরী এরকমই, যুদ্ধে পাঠাও—জয়ী সে হবেই। কিন্তু ছোট শিরমতী, ছোট কূর্মখালি, ওরা কি আবার নদী! দুই পারে চরই শুধু ঝকমক করছে, এত অগভীর এত অনুচ্চ। সুতরাং ডলুর 'গদু' সকাল থেকে নানা বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিয়ে ঠিক দুপুর নাগাদ একেবারে বসে গেলো আলকাতরার মতো কালো কাদার বুকে। ওর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল একটুও হেলবে না দুলবে না, তাই নিতান্ত নিঃশব্দেই অচল হলো। পুকুরের জলের মতন শান্ত জল, আঁচলের গ্রন্থি খুলে পাথরের কুচি বিছিয়ে আসছিলাম অনেকক্ষণ, রবিই প্রথমে লক্ষ্য করল, জোরে ডেকে বললো, 'কাকা, নৌকা তো মোটে টল্‌ছে না!'

কাঁচা ঘুম ভেঙে কাকা রেগে উঠলেন, 'টলছে না কিরে?'

রবি ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'না, টলছে না।'

কাকিমা ঘোমটা খুলে অবাক হয়ে গেলো, 'তাই তো!'

'মাঝি! এই মাঝি!'

'আজ্ঞে কর্তা, আমরা সব জলে নেমে গুণ টানবার জোগাড় করছি। মোটে এক হাঁটু জল, পানসীই শুধু ভাসতে পারে। আমাদের বড় নৌকা—পুরো জোয়ার না এলে—।'

'জোয়ার? বলো কি! সে তো সেই রাত্তিরে!'

'এক জোয়ারেও হয় কিনা সন্দেহ। দইয়ের মতো নরম থলথলে কাদা, নৌকার ভারি তলাটা একেবারে গেঁথে বসে গেছে। না বাবু, এ মানুষের কর্ম নয়! গুণ-টেনে তোলা দূরে থাক, গাঙের দুই জোয়ারেও যদি গদু ভাসাতে পারি, তবেই আমাদের নৌকাটা বাঁচল। আপনাদের আর কি বলুন না! তিনদিনের জায়গায় না হয় পাঁচদিন—'

ভিতর থেকে মা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সুহাস!'

'কি বলছ বৌদি?'

'রসদ? রসদ কোথায় পাঁচদিনের? কাল সকালেই যে সহরে পৌঁছে দেবার কথা ছিল। তোমার দাদা বিশ্বাস করে ওদের হাতে ছেড়েছেন—বলো!'

'তা আমি কি করব বৌদি? শুনতেই পাচ্ছ সব!'

মাঝি করুণ গলায় বললে, 'মাঠাকরুণ, আজ রাতটা তো চালিয়ে নাও। কাল সকালে যেমন করে হোক—'

রবি আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম—ব্যাপার গুরুতর। সুতরাং গোপন আনন্দে দুজনেই দুজনের হাত চেপে ধরলাম। নতুন অভিজ্ঞতা! কাণ্ডজ্ঞান যাদের নেই, তাদেরই এত খুসী হবার কথা।

কিন্তু নতুন কাকিমারও বোধ হয় কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল; সে হেসে এক হাঁটু জলে নেমে পড়ল। নদীতটে সরস সুন্দর শাক, বেছে বেছে তুলে মার হাতে দিয়ে বললে, 'দিদি, নাও।'

চাকরটা কাপড়ের জাল পেতে কুচো চিংড়ি ধরল। বিপদের মধ্যেও সংসার গড়ে উঠল একটা। সারা রাতই থাকতে হবে তো!

কখন সন্ধ্যা হলো, অজানা দেশের অজানিত নদীচরে আকাশভরা তারার নীচে কখন যে ঘুমে মুদে এলো চোখদুটো, কিছুই মনে নেই।

তারপর একসময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো—নৌকার তলদেশে নদীর জলে সুমধুর কুলু-কুলু-সিন-সিন শব্দ, জোয়ার এসেছে। শুনতে পেলাম, মা বলছেন কাকাকে, 'সুহাস, ঠাকুরপো!'

'উঁ!'

'মাঝিগুলো ওঠে না কেন? ঠেলে জাগিয়ে দাও না!'

হালের মাঝি শুনতে পেয়ে নিজে থেকেই বললো, 'জোয়ার এলে মাঝিরা ঘুমায় না, মা। জেগেই আছি। কিন্তু উঠে কি করব? এখনও আধ পো; দেড় পো জোয়ার না এলে তো এ জাহাজ ঠেলে তোলা মানুষের সাধ্য নয়।'

'তবে তো সকাল হয়ে যাবে, বুড়ো। ছোট ছেলেমেয়েগুলোর আবার দুধ চাই, এদেরও দিতে হবে দশটার মধ্যে ভাত—'

'ভয় নেই, মাঠাকরুণ। যেমন করে পারি, গুণ টেনে হোক বা নৌকা কাঁধে করে হোক, সামনের গ্রামে পৌঁছিয়ে দেবো। আর দুধ? কাদাজলে মোষ দেখেছ মা? দুধওয়ালা কি একটাও মিলবে না? দুইয়ে এনে দেবো। না পেলে ছাগী আছে, একটাকে ধরে—'

'ঠিক বলেছ মাঝি, ঠিক বলেছ। ভোর-ভোর দুইয়ে দিও কিন্তু। চা যেন পাই সাতটায়'—সুহাসকাকা চেঁচিয়ে বললেন। কাকিমা ফিক করে হেসে আমার কাঁধে মুখ লুকালো। মা বিরক্ত হয়ে আর কথাটি বললেন না।

'ওরে মইনু মিঞা, ওঠ, ওঠ। উঠে তামাক সাজ। কলকেয় তামাক পুড়তে-না-পুড়তেই লগি ঠেলাঠেলি, বুঝলি? মিন্নত আলি, টিনের উনানটা জ্বেলে ভাত ক'টি বসিয়ে দাও দেখি। নইলে আল্লা ভাত আজ আর কপালে লেখেনি জানবে।' সুদক্ষ কাপ্তেনের মতো বুড়ো মাঝি দড়িদড়া খুলে প্রস্তুত হতে লাগল। মুখে অভ্যস্ত বুলি, যুদ্ধ-নাবিকের আদেশের মতন সংক্ষিপ্ত ও সরল। উৎসাহের প্রাবল্যে শয্যা ছেড়ে আমরা প্রায় সকলেই উঠে বসলাম; সুহাসকাকাই কেবল চা না পেলে চোখ খুলবেন না, সরকারী জাহাজে তিনিই একমাত্র কম্যাণ্ডার—বেড-টী তাঁর চাই। নইলে অবৈতনিক অভিভাবকত্ব? কাকা

তাতে রাজি নন।

এদিকে দেড়পো জোয়ারের জল নদীচরের উপর আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়তে না পড়তেই মাঝিদের দুজন গুণ কাঁধে নেমে পড়ল, আর দুজন লগি হাতে দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত রইল।

অনেকক্ষণ ঠেলাঠেলির পর নৌকা সামান্য একটু নড়ল। বোঝা গেলো আরও বাড়ন্ত জলের দরকার। ততক্ষণে ছাগীও একটা ধরে ফেলা হলো, চায়ের জল চড়ল, চা হলো, সুহাসকাকা উঠলেন ; প্রভাতের অপূর্ব সূর্য শ্বেতবলাকার ঝাঁকের উপরে নয়ন-রশ্মি ফেলেছে। পাখার আঘাতে পাখিরা সুনীল আকাশকে স্বপ্নময় করে তুললো। কিন্তু নৌকা আর এক পা নড়ল না। কাদাতে বসে গেছে যে তবী, তাকে আগে ভাসানো চাই। চাকর, দারোয়ান, হালের মাঝি, দাঁড়ের মাঝি, সবাই মিলে কত টানাটানি কত খোসামোদ—উঁহু, নৌকা অসম্মত!

খোলা হাওয়ার নিদ্রাতৃপ্ত এবং এখন চা-রসে সঞ্জীবিত সুদীর্ঘ দেহখানা নিয়ে কাকা এবার হুঙ্কার ছেড়ে উঠে পড়লেন। 'কি? নৌকা চলবে না?'

রবি হেসে হাততালি দিয়ে বললে, 'না। চলবে না।'

'মাঝি, চলো গ্রাম থেকে লোক ধরে আনি।'

'গ্রাম কোথায়, বাবু? যতদূর দৃষ্টি যায়, ধূ ধূ করছে চর! তবে মাইল পাঁচেক দূরে বোয়ালখালির ছোট খাল পার হয়েই করতাল গ্রাম—'

'করতাল? আরে চলো, চলো। ওখানেই আত্মীয়বাড়ি আছে যে আমাদের!'

'কিন্তু চলব কি করে? খাল তো নয়, নালা একখানা। দুইখানা পানসী পাশাপাশি চললেই গায়ে ঠোক্কর লেগে যায়।'

'কিন্তু'—বলে চোখ লাল করেই কাকা থেমে গেলেন। সুহাসকাকা জমিদারের ছেলে, জমিদারী মেজাজ, জনমজুরের উপর যখন-তখন রাগ দেখানো তাঁর স্বভাবধর্ম ; কাকিমা কিন্তু নববিবাহিতা হলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। চোখে নিষেধের বিদ্যুৎ হেনে ঘোমটার আড়াল থেকে সে-ই কাকার অবুঝ ক্রোধকে থামিয়েছে ; নইলে খালেবিলে গুণ্ডা মাঝিদের সঙ্গে হাতাহাতি লেগে যেতো। তারপর মানুষ ক'টাকে কাদায় পুঁতে জলে হাত ধুয়ে ডলুর মানুষ নিঃশব্দে ফিরে যেতো আবার সেই ডলুর দেশে।

কাকা তখনো বেপরোয়া দাঁড়িয়ে। মা হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে বললেন, 'সুহাস, মাঝিদের বলো জল বাড়লে নৌকো একটু ভাসবে। তখন গুণ টেনে ওরা যেন এগিয়ে যায়। বোয়ালখালির যতদূর সম্ভব কাছে গিয়ে তুমি, একজন মাঝি আর চাকর, নেমে. পড়ো। হেঁটে করতালে যাও চলে, নইলে—'

ক্রমে মাথার উপর রোদ প্রখর হয়ে উঠতে লাগল। বলাকারা সাদা পতাকার মতো অবসন্ন দেহে বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দুলছে, দু'একটি তখনো ছায়ায় ফেরেনি। ক্ষিধেয় কাঁদতে লাগল ছোট ভাইবোনগুলি, হরলিক্‌স্ আর বিস্কুট দিয়ে ছোটদের ভোলানো হলো। বড়রা খায় কী?

অগত্যা একজন মাঝি আর নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে কাকা গ্রামের উদ্দেশে বেরিয়ে

পড়লেন। আমি আর কাকিমা জলের ধারে গুম হয়ে বসে রইলাম। নদীতটের অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রহরে প্রহরে নানাভাবে বিকশিত হতে লাগল। সামান্য বয়স, তবু বিস্মিত হয়ে ভাবলাম—এখানে কেউ দেখবার নেই, কার জন্য তবে প্রকৃতির এমন সাধনা? কি স্তব্ধ, কি গম্ভীর, কত যে উদাস এক ধ্যান! অথচ তারই মধ্যে জোয়ারের জল ফুলে ফুলে উঠছে, খানিকক্ষণ পরে 'বাথুয়া' শাকের মাথাও একেবারে ডুবে গেলো। হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠে সুবৃহৎ নৌকাখানা একের পরে একে দুই-তিনবার দোল খেলো।

মাঝিরা সোরগোল করে উঠল, 'দিদিমণি, বউমা, উঠে এসো, উঠে এসো! আল্লা-হু-আকবর! অন্তত করতালে পৌছে যেতে পারব।'

তটভূমি 'তমালতালীবনরাজিনীল' নয়। তৃণাস্তরণে ঝোপঝাড়, কেতকীর কণ্টক, মাঝে মাঝে অনামা বড় বড় গাছে লতার কুঞ্জ ; স্বচ্ছ শান্ত জলে মুখ দেখছে আতপ্ত নীল আকাশ, ঘাটে শীতল ছায়া অমন দগ্ধ দুপুরেও। বুঝলাম, গ্রাম নিকট। দাঁড়ের জোয়ান মাঝি মুখে হাত দিয়ে অতি উচ্চ সাংকেতিক রবে কাকাদের আহ্বান করতে লাগল বারবার।

বেলা চারটে তখন। গ্রাম থেকে সাড়া পাওয়া গেলো। বুড়ো কাপ্তেন বললো, 'ফিরে আসছে ওরা।'

খানিক পরেই অনেক লোকজন নিয়ে এক তরুণ যুবক নৌকার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিতাই আর মাঝি ফিরেছে, কাকা কোথায়?

'বড় বউদি, আমি রমেশ। চিনতে পারছেন কি?'

উত্তরে একহাত ঘোমটা টেনে আমাদের হাসির উদ্রেক করে মা জড়সড় হয়ে বসলেন। অর্থাৎ চিনতে পারেননি। কাকিমা ছেলেমানুষ, মার দেখাদেখি সেও গুণ্ঠন টানলো। না টেনে করে কি? ভদ্রলোক—ওই রমেশ—অপ্রতিভ হয়ে, নিতান্ত অসহায় দৃষ্টি, আমার মুখে তুলে বললো, 'খাবার এনেছি যে!'

আমি হাসি চেপে জোর করে গিন্নি সেজে বললাম, 'তা বেশ। কিন্তু কাকা কোথায়?'

'রোদে হেঁটে সে আর ফিরতে পারল না। আমি—আমিই নিয়ে যেতে এসেছি সবাইকে। আজ রাতটা আমাদের বাড়িতেই খাবে। এখন এই জলখাবারগুলো নৌকায় তুলে নাও। মাকে বলো আমি রজনীর ছোটভাই রমেশ। সহরে আমাকে অনেকবার দেখেছে—'

'মীনা!' মুখের উপর থেকে ঘোমটা সরিয়ে মা তাড়াতাড়ি উঠে এলেন, 'টুনু, তুমি?'

'হ্যাঁ, বউদি। বছর দুই কলকাতায় থেকে এতই কি বদলে গিয়েছি যে চিনতেই পারলেন না হঠাৎ? যাহোক, এখন একটু জলযোগ করে কাপড়-চোপড় নিয়ে উঠে আসুন, বাড়িতে স্নানাহার করে সুস্থ না হলে ছাড়ছিনে কাউকে।...মাঝি, পেঁপেতলার পুলের নীচে নৌকো বাঁধবে—সেখানে খাল গভীর। তোমাদের সিদেও এলো বলে। রান্না করে খেও। আমি এঁদের নিয়ে চললাম, জিনিসপত্র সাবধানে পাহারা দেবে।'

বর্ধিষ্ণু প্রাচীন চালের গৃহস্থবাড়ি। সামনে পুকুর পিছনে পুকুর, দুইপাশে বাগান। কেমন যেন স্তব্ধ শান্ত। লোকজনে ভরা, অথচ নিঃশব্দ।

আঁচল দুলিয়ে ঘুরঘুর করছিলাম চারদিকে। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা, যাকে নিয়ে এই গল্প।

বলেছিলাম, চৌদ্দ পেরিয়ে তখন সবে পনর'য় ফুটে উঠেছি। কিন্তু—

ফুটে-ওঠা কাকে বলে? এর তুলনায় আমি যেন একটি রুগ্ন ফুল। ক্ষীণ দীর্ঘাঙ্গী সে—না তরুণী, না বালিকা। তবু মনে হয়, কলিও নয় আর। বিকশিত নয়, মুকুলিত যৌবনের চাপা আলোকে মুখখানি ঝলমল—তরল মেঘে ঢাকা বিজলীর মতো। সে মুখ সুন্দর কি? জানি না। আজও বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারি না।

অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি। খপ করে আমার হাত ধরে বললে, 'তুমি কে?'

চমকে বললাম, 'মীনা।'

'ওই অতিথিদের মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সোনালু—'

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। এ কোন্‌দেশী নাম?

হেসে হাত ধরে টেনে, পুষ্পিত এক গাছের নীচে এনে সে বললে, 'ওই দেখো, ওই সোনালু ফুল। ওরই নামে আমার নাম।'

'সোনালি?'

অবজ্ঞায় সে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'বলতে পারো! তোমরা সহুরে কিনা! গাঁয়ে আমরা সোনালুই বলি। অন্তত এদিককার গাঁয়ে।'

'কিন্তু—তুমি কাদের মেয়ে?'

'মেয়ে হতে যাবো কেন? এদের বাড়ির বউ।'

'বউ? কার বউ?'

'রমেশদার—', হেসে সে মুখে হাত চাপা দিলো। তারপর খিলখিল করে আরো হেসে ছুটে পালিয়ে গেলো ওখান থেকে। ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতো। সোনালি কিন্তু ফিরল না তখন।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার সে কি ঘটা! যত ঐশ্বর্য ওদের জমানো ছিল সাতপুরুষের আমল থেকে, সমস্ত এনে খাবার ঘর আর বসবার ঘরদুটি সাজিয়েছে। গ্রামে এত ঐশ্বর্যও বিরল, এমন রুচিও সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এই রুচি হালফ্যাসনের নয়। খাবারের আসন, চেয়ার নয়—পিঁড়ি। আশ্চর্য হতে হয় সেগুলোর কারুকার্য দেখে। বসব, না মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করব ভাবছি, কাকিমা লতাপাতার উপর হাত বুলিয়ে বললেন, 'অথচ দেখ, কি মসৃণ!'

আসনের সামনে, ভূমির থেকে সামান্য উঁচুতে পায়ার মতন ছোট ছোট টেবিল। প্রত্যেক আহারার্থীর সমুখে পঞ্চপ্রদীপের মতো পাঁচমুখী ঝল্‌মলে আলো। বিদ্যুতের নয় অবশ্য ; কিন্তু গৃহজাত সুগন্ধি তেলে, মেয়েদের আপন হাতে পাকানো সল্‌তেয় সে আলো দেবতার আরতির দীপের মতোই জ্বলছে। পুরানো কায়দায় অতিথির এমন সম্মান আর

কোথাও দেখিনি।

খাওয়ানোর সময়ে বাড়ির বড় বউ স্বয়ং পরিবেশন করলেন। আমার মনে হতে লাগল—খাবো, না এক-একটি করে এঁর রূপই শুধু দেখতে থাকব? বঙ্কিমবাবু নারীরূপের যে বিচিত্র বর্ণনা করে গেছেন, তারপরে ও-বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া আমাদের পোষায় না ; সঞ্চারী একটি স্থলকমলের মতো এই বধূটি তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ নায়িকাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। তবু আমার কেবলই মনে হলো—সেই বউটি কই? সোনালি? সেই তিলোত্তমা!

একে একে প্রায় সব মেয়েরাই এলো, আধঘোমটায় মুখ ঢাকা গৃহস্থের বাড়ির বউ-ঝি। এ-বাড়ির এই নিয়ম। চাকরদাসীরা নয়, কন্যা ও বধূরাই অতিথিদের পরিচর্যা করে। আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে খাবো কি—বরং তটস্থ হয়ে উঠলাম।

হঠাৎ এক সময়ে আমার ইতস্তত ভ্রাম্যমান চঞ্চল চোখদু'টি সোনালিকে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলো বড় ঘরের আধো-ছায়ায়-ঢাকা উঁচু বারান্দায়। দুইপা উঠানে ঝুলিয়ে বসেছিল। রমেশ কতবার আসা-যাওয়া করছে সেই পথে! অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। এ কি রকম বউ?

ভালো করে খাওয়াই হলো না আর। সোনালি আমারই বয়সী, অথচ অপূর্ব লাবণ্যবতী। সেইজন্যেই কি মন উচাটন করে উঠল ওর সঙ্গ পাওয়ার জন্য?

বড় বউকে বললাম, 'মাসিমা, আমি উঠি?'

'কেন? সব যে পাতে পড়ে রইল মীনা! না, না, উঠো না মা, মাথা খাও—দইটুকু...'

কাকিমা হেসে বললো, 'আপনাদের ওই ছোট্ট বউটিকে ডাকুন তাহলে—'

'ছোট বউ? কে? কার কথা বলছ?'

'ওই যে।'

পিছন ফিরে তাকিয়ে বড় বধূ অবাক হয়ে গেলেন, 'ওমা, সোনালু আবার এ-বাড়ির বউ হলো কবে? ও তো—', বলেই থমকে তিনি থেমে গেলেন।

রমেশ দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে আসছিল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম মুখখানা ওর কেমন হয়ে গেলো—সোনালিকে সেও দেখছে।

কান্না পেলো...যথেষ্ট বয়স বুদ্ধি হয়নি যে রহস্যকে বিশ্লেষণ করব। কান্নাই পেলো শুধু। কি রকম মেয়ে ওই সোনালি? কয়েক ঘণ্টার অতিথি আমি, প্রতারণা করল আমাকে? কেন?

সকালবেলা পুকুরঘাটে মুখ ধুতে গিয়েছিলাম। সাদা ধপধপে দুটি রাজহাঁস শুভ্র তরীর মতো তর্-তর্ করে ভেসে বেড়াচ্ছে। এক কোণে পদ্মের ঝাড়, আর কোণে কুমুদ। বাকি দুই কোণে দুই ঘাট। মনে মনে ভাবছি, এ-বাড়ির লোকেরা বেশ সৌখীন, পুকুরে পদ্ম আর কুমুদ রেখেছে জল-উদ্যানের মতন ; অথচ পদ্মলতা বা কুমুদবনকে সারা পুষ্করিণীর বুকে বেড়ে বেড়ে জঙ্গল তৈরী করতে অথবা জলকে খারাপ হতে দেয়নি। পানা কোথাও নেই। সাধ হলো সাঁতার কেটে ফুল তুলব কয়েকটা। আমিও তো গ্রামেরই

মেয়ে, গভীর কালো জল দেখে ভয় পাই না, সাঁতারও জানি, সুতরাং মনে বাসনা জাগা মাত্রই নেমে পড়লাম। আকণ্ঠ ডুবিয়ে জলে ঢেউ তুলে অগ্রসর হচ্ছি, পিছন থেকে কে বললো, 'সাবধান!'

সচকিতে ফিরে দেখলাম : সোনালি!

ঈষৎ হেসে বললে, 'রাজহাঁসদুটো তোমাকে চেনে না, তাড়া করতে পারে। একটু থামো। আমিও নামি।'

অভিমানে আমার মুখ কালো হলো। তবু চোখ ফিরাতে পারলাম না, ওর দিকে চেয়েই রইলাম—কি কোমল কি কমনীয় ওর কিশোর রূপ! হায় সোনালি, কেন আমাকে ঠকালে? এত সুন্দর তুমি, কিন্তু—

চোখ তুলে সে বললে, 'কি গো সহরের মেয়ে, কথা বলছ না যে?'

'কেন তুমি মিথ্যে বললে কাল? আজই তো আমরা চলে যাবো, কিন্তু তোমাকে আমি ভুলতে পারব না। ভালোবেসেছি বলে নয় ; ভালোবাসতাম—যদি তুমি অকারণে মিথ্যে কথা না বলতে!'

সোনালির সুদীর্ঘ বেণী সাপের মতো ওর কম্বুকণ্ঠকে বেষ্টন করে ছিল। জলের উপর ভাসতে ভাসতে সে একহাতে বেণীবন্ধন থেকে চুলের রাশি মুক্ত করতে লাগল। আমি কিছুই বললাম না। শুধু দেখতে লাগলাম ওর অধরে হাসি তখনো মিলায়নি, কিন্তু চোখের রঙ পুকুরের কালো নীরের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলো। কেন জানি না, কঠোর কথা বলেছি বলেই মনে হলো। কিন্তু সিঁথিতে ওর সিঁদুর কই? কঠিনতর হলো আমার মনের ভাব।

বললাম, 'আমার সমবয়সী তুমি, কিন্তু যে কথা বললে কাল, আমি নিজের কানে না শুনলে ভাবতেও পারতাম না—'

'কেন? সহরে পড়াশোনা করে কি এতই কপট হয়ে গেছ? ওই দেখো—', রাজহাঁসের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'বামুন পুরুত ডেকে কি বিয়ে হয়েছিল ওদের, তবু ভালোবাসা মানুষের চেয়ে কম নাকি? না, স্বামী-স্ত্রী নয় ওই পাখিদু'টি?'

হাঁ করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। বলে কী মেয়েটা?

'কি নাম তোমার? ভুলে গিয়েছি।'

বললাম, 'মীনা।'

'রমেশদা তোমার কি হয়?'

'কাকা।'

'ও, তবে তো তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না! পারলে শুনতে, সোনালু অত মিথ্যাবাদিনী নয়।' স্ফুরিত অধরকে জলের উপর বিকশিত করে লাবণ্যময়ী মনে মনে কী-যেন জপ করলো। তারপর আকাশের দিকে ছায়াচ্ছন্ন চোখদুটি উত্তোলন করে বললে, 'সামাজিক বিয়ে আমাদের হতে পারেনি, হবে না। কিন্তু রমেশ আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

'কেন? কেন?' একসঙ্গে অনেক কথা আমার জানতে ইচ্ছা হলো, তাই অনেকগুলি 'কেন' উচ্চারণ করে নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম।

সোনালি কিন্তু নিজের মনের মতন উত্তর দিলো। বললো, 'কেন? ওই রাজহাঁসদের জিজ্ঞাসা করো—কেন। ওরা জানে আমরা ভালোবাসি।'

'কিন্তু—'

'বিয়ে হবে না। কেন? আমার বাবা চুরি করে জেল খাটছে। মা এদেরই বাড়ির দাসী। আমি—আমি দাসীর মেয়ে, তবু রমেশ আমায় ভালোবাসে, সত্যিই ভালোবাসে।'

শুনে কিশোর মনের নবীন অভিজ্ঞতার উৎকণ্ঠায় আমি অধীর হয়ে উঠলাম! বললাম, 'কাল রাতে বড় বউ বলছিলেন—'

'জানি, জানি। সবাই বলে।'

সজল চোখে বললাম, 'তাহলে উপায়?'

'উপায়—রমেশ। ওরই জন্যে এ-বাড়িতে আজীবন দাসীপনা করব।'

'কিন্তু পরে যদি বউ আসে?'

'কার বউ? রমেশের? আসবে না।'

'কি করে জানলে?'

'ও যে আমায় বিয়ে করেছে!'

অনিষ্ট বোধ হয় আমার দ্বারাই হলো। নইলে একদিন হয়তো ওদের সত্যি-সত্যি বিয়েই হতো। অবশ্য, সত্য করেই বলব—সোনালির কথা ভাবলে সত্য বিয়ে কী, মিথ্যা বিয়েই বা কী, আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না।

যাক সে কথা। সেদিন বয়স আমার মাত্র পনেরো। ভাইয়েরা ছোট ; পিতৃব্য ও মাতুলজাতীয় পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকে তখনো দেখিনি। সোনালির হৃদয়রহস্য আমার কাছে এক মহা সমস্যার বিষয় হয়ে উঠল। হেসে উড়িয়ে দিতাম, যদি না মনের কোথায় ব্যথা বাজতো। উড়িয়ে দিতে পারলাম না বলেই কাকিমা—সুহাসকাকার নববধূর কাছে সব কথা বললাম।

সে শুনে আতঙ্কিত হয়ে বললে, 'কি সর্ব্বনাশ।'

'কেন? ভয় পাচ্ছ কেন কাকিমা?'

'বিয়ে-টিয়ে কিছুই নয়। ওরা খারাপ হয়েছে, মীনা। রমেশ ঠাকুরপো বিগড়ে গেছে, ওই মেয়েটাই নিশ্চয়—'

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম।

সাঁঝের আলোয় আমাদের নৌকা ছাড়ল।

দেখলাম, রমেশ বিষণ্ণ নতমুখে সবাইকে নৌকায় তুলে দিলো। আমাদের বিদায়-ব্যথায় বিষণ্ণ কি? না। নিভৃত দুপুরে অতি গোপনে সোনালির সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল, সুতরাং আমিই বিশেষ করে জানতাম এই বিষাদের অর্থ কী। রমেশের চোখের দিকে তাই চোখ তুলতে পারলাম না।

ধীর মন্থর গতি এতবড় নৌকার। জলপোতের মতন কতকগুলো পাখিও ভেসে

রয়েছে দূরের তটপ্রান্তে, তাদেরও গতি মন্থর ; কারণ সূর্য ডুবে গেছে, এরা শীঘ্রই আশ্রয় নেবে ঝোপে-ঝাড়ে। আমাদের নৌকাখানি স'রে যাবার অপেক্ষায় আছে।

মাঝি বললো, 'বুনোহাঁস, দিদি! নেবে একটা? ধরে দেবো?'

'না.মাঝি, মেরো না, থাক।'...

মানস-মিলনে শুনতে লাগলাম সোনালির কথাগুলো :

'মীনা, তুমি একি করলে? আমি দাসীর মেয়ে বলে কি তোমারও রাগ? সব কথা সবাইকে বলে দিলে! দিয়েছ তো দিয়েছ। কিন্তু তাকিয়ে দেখেছ রমেশের মুখের দিকে?'

'সোনালি, আমরা ভাবতেও পারি না—'

'জানি। কিন্তু তোমাকে আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। উঃ, কী ভয়ানক মেয়ে তুমি! বড় বউঠাকরুণকে বলে বসলে, যে, রমেশ আমাকে—আমায়—'

শিহরিত হয়ে বললাম, 'না সোনা, ওকথা আমি বলিনি, ছি! না, না, ওকথা আমি বলিনি। বিশ্বাস করো।'

'রান্নাঘরে যাও। দেখো গিয়ে, আমার মা আজ কিছুই খায়নি, খেতে পারেনি। কেন জানো? সামনের মাসের প্রথম লগ্নেই আমার বিয়ে—', বলে সে একটু হাসল।

আমি আশ্বাসে আনন্দে ওর হাত চেপে ধরে বললাম, 'রমেশের সঙ্গে?'

ধক্ করে সোনালির চোখে বিদ্যুৎ জ্ব'লে উঠল। তখনই আবার অধরে হেসে বলল, 'না। আমার ভাবী বর—এদের বাড়ির গরু চরায়। দেখবে তাকে?'...মনে মনেই দেখতে লাগলাম ; চোখের জল ঝরে পড়ল আমারই দুই কপোল বেয়ে। কিন্তু সোনালি স্থির। কাঁদল না মোটেই। সেই প্রথমবারের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল ; সভয়ে মুখের দিকে মুখ তুলে দেখলাম—চোখ, ওর চোখ! মানুষের চোখ কি রাগে অমন হয়?...

হঠাৎ সন্ধ্যার যাদুমায়াকে ছিন্ন ও দীর্ণ করে পাখির করুণ ক্রন্দনে জলভূমি চমকিত হয়ে উঠল। মাঝি বুনোহাঁস মেরেছে। ওদিক থেকে সুহাসকাকার লোভী কণ্ঠ চেঁচিয়ে বললো, 'জুড়িটা—ওর জুড়িটাকেও মারো।'

অপার্থিব, অকারণ ভয়ে রোমাঞ্চিত হলো আমার দেহ। হায়, হায়, মানুষেরা মারবে—মারবে প্রকৃতির প্রেমকে, মারবেই গলা টিপে!

দূর-দিগন্তে এখনই আভাস, চট্টল নগরীর। কিন্তু ওই সুন্দর দৃশ্য শুধু তো সুন্দর নয়! আজ সন্ধ্যার আভাসে কর্ণফুলী ও শঙ্খ একযোগে অশ্রু উৎসারিত করছে নীহারসমাচ্ছন্ন আমারই জন্মতটের দিকে—আমি যে হত্যাকারী, আমি যে সোনালির ভবিষ্যৎকে মেরে এলাম।

কাকিমা কাছাকাছি সরে এসে বললে, 'মীনা, কি হয়েছে তোমার?'

'তুমি বলে দিলে সব কথা!'

'বলেছি তো কী হয়েছে? মেয়েটা ভারি—ইয়ে। জানো?'

'না, কাকিমা।'

'হাঁ, মীনা। বড় বউঠাকরুণ বলছিলেন, রমেশ ঠাকুপোকে কাল-পরশুই কলকাতায় চালান দেবেন। তুমি জানো না কিছুই। ছেলেমানুষ!'

'তারপর, সোনালির কী হবে?'

'কেন? বিয়ে হবে—বর ঠিক করাই আছে শুনলাম।'

'দেখেছ তুমি?'

'আমার বয়ে গেছে দেখতে।'

'অমন সুন্দর মেয়ে!'

'হলোই বা সুন্দর।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পরে বললাম, 'কাকিমা, মাঝিটা অসময়ে বুনোহাঁস মারল কেন?'

'তোমার কাকার খেতে সখ হয়েছে—তাই।'

'আমরাও আজ একজোড়া বুনোহাঁস মেরে এলাম। তুমি আর আমি।'

নতুন কাকিমা প্রথমে অতিশয় আশ্চর্য হয়ে, তারপরে আমার মুখ সযত্নে নিরীক্ষণ করে বিচক্ষণভাবে বললে, 'বুনো পশুপাখি নিয়ে কবিত্ব করা চলে, কিন্তু ঘর করা চলে না। রমেশ ঠাকুরপোকে একদিন সত্যিকারের ঘরকরনা করতে হবে।'

সত্য কথা।

রমেশকে ঘরকরনায় রাজি হতে হয়েছিল। খুসি হয়ে করেছিল কিনা জানি না, কিন্তু বিয়ে করেছে রমেশ। বছরখানেক না ঘুরতেই আমরা আবার অতিথি হয়েছিলাম সেই নদীর দেশে। দেখলাম রমেশের বউকে। তেরো-চৌদ্দ বছরের ছিপছিপে মেয়ে, মুখখানি কিন্তু গম্ভীর, যেন কত বয়স হয়েছে।

আমি টিপ্পনি কেটে কাকিমাকে বললাম, 'খুব মানিয়েছে রমেশকাকার সঙ্গে, না?'

কাকিমা জেদের সঙ্গে বললে, 'রূপ রূপ করে তুমি তো গেলে। যাও, শোনো গিয়ে তোমার বুনোহাঁসের গল্প।'

'না, আমার সাহস হয় না। তুমিই বলো। গলায় কলসী বেঁধে মরেছিল নাকি?'

'অত ভালো মেয়ে নয়। উড়ে পালিয়েছে।'

নিতান্ত অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললাম, 'অসম্ভব।'

একে একে সব কথাই শুনলাম। সোনালির বিয়ে স্থির হয়েছিল সেই গো-রক্ষকের সঙ্গেই। কিন্তু কিছুতেই ওকে রাজি করানো গেল না ততক্ষণ, যতক্ষণ না স্বয়ং রমেশ এসে অনুরোধ করল, 'সোনা, বিয়ে করতে হবে। আমাদের মুখ রাখো।'

তখন সে মৃদুস্বরে বললে, 'আচ্ছা।' তারপরে সেই চিরাভ্যস্ত হাসি হেসে প্রতিদিনের গৃহকর্মে রত রইল মেয়েটা। কেউ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করতে পারল না যে, ওর মনের মধ্যে কোথাও জমাট অন্ধকার নীড় বেঁধেছে। অথচ চাপা মেয়ে সে কোনদিনই নয়।

বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত সোনালি স্বাভাবিকভাবেই ছিল। নূতনত্বের মধ্যে এই যে, খিড়কির পুকুরঘাট ফেলে সে প্রায়ই নদীর ঘাটে ডুব দিতে আসত। এ-বাড়ির রীতি নয় সেটা। কিন্তু ওকে বারণ করবে কে? বউও নয়, ঝিও নয়। আগে যদিই বা কিছু আদরিণী ছিল, এখন বড় বধূ ওকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। রমেশ তাঁর হাতে মানুষ।

যা বলছিলাম : বিয়ের আগের দিন সোনালি নদীর ঘাটে গিয়েছিল। সূর্য ডোবে-ডোবে, চাষীরা ঘরে ফিরছে, দু'একজন সোনালিকে পথে যেতে দেখেছে।

গ্রামের পথে কিছুই বিচিত্র নয়। সেই গো-পালক বেচারাও সন্ধিগ্ধচেতা নয়। সোনালি যদি অকারণে এখানে-ওখানে ঝোপে ও ঝাড়ে থমকে দাঁড়ায়, যদিই বা অকারণে তার হাতে পদ্মফুল থাকে, তবু পথচারী ও চাষীরা ভেবেছিল—সে নদীর জলে ফুল ভাসিয়ে খেলা করতে যাচ্ছে। কতটুকুই বা মেয়ে! তাও আবার গ্রামের চিরচেনা মেয়ে। ওকে নিয়ে মাথা ঘামায় কে?

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'রমেশকাকা দেশে ছিলেন না তখন?'

'তিনি তো কবে সেই কলকাতার—নির্বাসনে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! সোনালিকে ফিরতে কেউ আর দেখেনি।'

'জলে ডুবে মরেছে?'

'কি জানি!'

'কিন্তু—সাঁতার জানত ওই রাজহাঁসেরই মতো। দেহও তো পাওয়া যায়নি। কেবল কাপড়—একখানা শাড়ি, কালোপাড়ের, সেদিন যা প'রে গিয়েছিল—বন বাথুয়া শাকের উপরে কাদার মধ্যে লুটিয়ে ছিল। আর ওর চুড়ি দুইগাছি ঝিকমিক করছিল অর্ধপ্রোথিতভাবে।'

আত্মহত্যা?

'না। কোন্ দুঃখে আত্মহত্যা করবে? শেষদিন পর্যন্ত ওর মুখের হাসিতে সবাই হেসেছে। সুখী মানুষ হঠাৎ প্রাণ দেয় না।'

তবে কী হলো সোনালির?

অজানা।

ফিরছিলাম আমরা, ধীরে-ধীরে, ধীরে-ধীরে চট্টলের পথে। এবারে আর গুণ টেনে নয়, ভাঁটার আকর্ষণে হালকা নৌকা সহজে নেমে যাচ্ছে শঙ্খ-কর্ণফুলীর চিরসঙ্গমের দিকে।

কি মনে হলো জানি না—আস্তে একটি ফুল ফেলে দিলাম স্রোতোবেগের উপর। বন্য তৃণে আবদ্ধ না হলে এই ফুলও আমাদেরই মতো নদনদীর বিপুল মিলনতলে এক সময়ে হঠাৎ হারিয়ে যাবে।

কে জানে সোনালি আত্মহারা হয়ে সেখানেই গেছে কিনা।

নিমগ্নচিত্তে বসেছিলাম। সন্ধ্যার রক্তবন্যা মেঘমেদুর পাহাড়ে পাহাড়ে উতলা ইন্দ্রধনুর নানাবর্ণ সৃষ্টি করেছে। সাগরমেখলা চট্টলা যেন কোন্ অপরূপ স্বপ্নতারাতুর দেশ। এদিকে শঙ্খ, ওদিকে কর্ণফুলী। তীরভূমি তমালতালীবনরাজিনীল। আমাদের তরীখানি তরঙ্গ-সংঘাতে মনে সেই চিরদিনের শিহরণ জাগিয়ে তুললো—আশঙ্কার ও উদ্বেগের। ও মাঝি এক যোগে ভগবানকে স্মরণ করল, 'আল্লা-হু-বিস্মিল্লাহ্!'

সভয়ে কাকিমা আমার কাছে ঘেঁসে বসলো। বললে, 'মীনা, শুধু এটুকুর জন্যেই আমার দেশে যেতে ভালো লাগে না।'

যেন ধ্যান ভেঙে উঠলাম। ডাকলাম, 'মাঝি!'

'কি বলছ, দিদিসাহেবা?'

'যদি—আচ্ছা ধরো, যদি সেই ইন্দ্রপুল থেকে কিছু ভেসে আসে এতদূর—'

'এতদূর যদি ভেসে আসে? তবে দিদি, একটানে সাগরেই হবে তার ঠাঁই।'

'কোথাও আটকাবে না?'

'অসম্ভব।'

'কিন্তু—যদি—যদি সে সাঁতার জানে?'

'মানুষের কথা বলছ? সাঁতার তো আমরাও জানি। কুমীর কচ্ছপও এমন জলের জীব নয়, যতখানি আমরা। কিন্তু এই দরিয়ার ঢেউয়ের মাথায় চড়তে না চড়তে মুখ দিয়ে আপনিই খোদার নাম বেরিয়ে আসে।'

শুনছিলাম, পাশে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ফিরে দেখলাম, কাকিমা সজল চোখে সভয়ে চট্টলার উত্তাল তরঙ্গবেগের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু হাসতেই ক্ষুণ্ণ হলো বোধ হয়। বললো, 'মীনা, তুমি কি সত্যই মনে করো যে বুনোহাঁসকে মেরেছি আমরা?'

'জানি না। কিন্তু রমেশকাকা ঘরকন্নায় রাজি হয়েছে, দেখেছো তো? রাজি হতে পারল না সে-ই, যে রাজহংসের বিয়ে দেখেছিল।'

'তুমি কি বলতে চাও যে, সোনালি একটি অসাধারণ মেয়ে ছিল?'

'তাও জানি না, কাকিমা। শুধু এইমাত্র বুঝেছি, তার সত্যই বিয়ে হয়েছিল রমেশের সঙ্গে, মিথ্যা কথা সে বলেনি।'

তারপর দুজনেই চুপ করলাম।

কিন্তু কল্পনা আমার ভেসে চললো সোনালির সেই দুটি রাঁজহাঁসকে ঘিরে।

দু'টিই মরে গিয়েছে।

সওগাত, মহিলা সংখ্যা, ১৩৫২

জ্যোতির্মালা দেবীর রচনাপঞ্জি

বিলেত দেশটা মাটির। শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা [আখ্যাপত্রে প্রকাশ তারিখের উল্লেখ নেই]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪, ১৫৪।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার চারটি লাইন এইরকম :

"ঐ বিলেত দেশটা মাটির,
সেটা সোনার রূপোর নয় :
তার আকাশেতে সূয্যি ওঠে,
আর ঐ মেঘে বৃষ্টি হয়।"

...দ্বিজেন্দ্রলাল

উৎসর্গ : শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণে—

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি জ্যোতির্মালা-লিখিত দু'খানি উৎসর্গ-কবিতা নিচে মুদ্রিত হল :

উৎসর্গ-কবিতা ১

শ্রীমা

ওগো কিরণ-প্রতিমা, প্রেম-মধুরিমা,
শুভ্র জ্যোছনা ধীর!
হেথা এলে কারে চাহি' সুধা-তরী বাহি'
ছায়াপথে উষসীর?
হের, নীলিমের বুকে শশী উন্মনা—
পরশে তোমার রাঙে ধূলিকণা,
সন্ধ্যার তারা সম্বিতহারা,
আকুল সাগরনীর!
দোলে ফুল সুকুমার শ্যাম-লতা-হার,
দীপমালা রজনীর!
ওগো, কার প্রেরণায় নামিলে হেথায়
রূপালি নিঝর-রেশে :
ঢালো বিরহী বিধু-র স্বপ্ন মেদুর
অবনী-কাজল-কেশে!
রাখি' উজল দীপালি গগন-বিতানে
আঁখি নত করি' চাও নিশা পানে—
পলকে উছলি' তিমির বিদলি'
হাসে তব উষা-তীর!
কার মিলন-স্মরণে বাজিছে চরণে
আলো-ছায়া-মঞ্জীর!

নববর্ষ, ১৩৪৩ —জ্যোতি

উৎসর্গ-কবিতা ২

শ্রীঅরবিন্দ—

মোহন! ঘন-শ্যামল-তনু!
এলে নব সাজে।
স্তব্ধ শঙ্খ, মৌন বাঁশি,
চরণে নত কুসুমরাশি :
তিমির নাশি'
মিহির-হাসি
কৌস্তুভসম রাজে॥

মোহন! ঘন-শ্যামল-তনু!
এলে নব সাজে।
রাস-রঙ্গ করি' নীরব
অতল-মন্ত্র-মন্দ্রে তব :
প্রখর-বিভব
ফেনোৎসব
মুখর মোহ লাজে॥

মোহন! ঘন-শ্যামল-তনু!
এলে নব সাজে।
সুধানিলয়-নীল-নয়ন,
কণ্ঠে নিধিছন্দ গহন
করি' বন্দন
গীতি-গগন
নিধ্বনি নতি যাচে॥

নববর্ষ, ১৩৪৩ —জ্যোতি

উৎসর্গ অংশের পরে জ্যোতির্মালা দেবীর লেখা-বিষয়ে (প্রধানত ছোটগল্প-প্রসঙ্গে) রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি এইরকম :

রবীন্দ্রনাথ

লেখিকার সম্বন্ধে আশ্বাসের কারণ রয়েছে তাঁর "রাশিয়ান ক্যাট" গল্পটিতে। তার মধ্যে যে-বেদনা আছে তা অল্প দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করবার মতো নয়, তার প্রাপ্তিস্বীকার করতেই হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের ওপরের মন্তব্যটি প্রচ্ছদের চতুর্থ মলাটেও মুদ্রিত হয়েছিল।

এই গল্প-সংকলনের 'পরিচিতি' অংশটি দিলীপকুমার রায় লিখেছিলেন। সেই লেখাটি নিচে যথাযথ মুদ্রিত হল :

পরিচিতি

জ্যোতির্মালার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯২৭ সালে—পারিসে। পরে স্কটলাণ্ডে লণ্ডনে বার্মিংহামে নিকট সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গতা হবার সুযোগ ঘটেছিল। সেই সময়েই জীবন সম্বন্ধে তাঁর সন্ধানী মনের পরিচয়ে আমি বিস্মিত হই। তখন অবধি অত অল্প বয়সে স্বদেশীয়া কারুর মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের জন্যে এত তৃষ্ণা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।

সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেছিলাম—কিন্তু ললিত সৃষ্টি তো শুধু ঔৎসুক্যে হয় না, অন্তঃপ্রেরণার অপেক্ষা রাখে। এখানে সম্প্রতি এসে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার দিব্যস্পর্শে ও যোগশক্তিতে সেই প্রেরণা পাওয়াতে সাহিত্যে সৃষ্টির দিক তাঁর খুলে যায় —কথা-সাহিত্যে, যেমন কবি হারীন্দ্রনাথের খুলে গিয়েছিল—ইংরাজি কাব্যে।

জ্যোতির্মালার আগেকার গদ্যের সঙ্গে তাঁর বর্ত্তমান গদ্যের দ্রুত বিকাশ তুলনা করলে এ-খুলে-যাওয়ার কথা আমার মনে না হ'য়েই পারে না। তার ওপর যখন ভাবি : বিলেত-দেশটা-মাটি'র গল্পগুলি তাঁর কথা-সাহিত্যে হাতে-খড়ি—তখন মনে বড় আনন্দ হয় ভাবতে যে, অন্তরে প্রেরণার ঢল নামলে সে নিজেই নিজের পথ কেটে নিয়ে এমনি সহজেই চলতে পারে। এ-কথা জানতাম বহুদিনই, কিন্তু তবু প্রতি জানা সত্যও যখনই প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে—একটু চম্‌কে দেয়ই। যিনি কখনো গল্প লেখেন নি, তাঁর প্রথম গল্পেই এমন বলিষ্ঠ সাবলীল ভাষায় ওদের দেশের ভালো-মন্দ এমন নিপুণ দরদী অথচ তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে ফুটে-ওঠা, ছোট গল্পের পরিসরে ওদের সভ্যতাব অন্তঃশীলা নানা ধারার রীতি-নীতি ফলিয়ে তোলা এত সহজে এমন সাবলীল ছন্দে— !...জানলার ছোট্ট একটা পাখী দিয়ে সমস্ত আকাশের অনেকখানি চোখে পড়ে : জ্যোতির্মালার সুকুমার রূপরেখায়ও (বিশেষ ক'রে তাঁর বড় উপন্যাসে) তেম্‌নি ওদের অচিন বিস্তীর্ণ সভ্যতার নানান্ গুণাগুণ ছবির মতন ফুটে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

যাঁরা গল্পে নিছক গল্প চান তাঁদের এ-গল্পগুলি কি রকম লাগবে বলা কঠিন—কারণ মানুষে মানুষে রুচিভেদ এত বেশি যে, সময়ে সময়ে কুণ্ঠা, এমন কি ভয়ও, একটু জাগেই কোনো শিল্পকলার রসোত্তীর্ণতার সম্বন্ধে কিছু বলতে—তবু আমার মনে হয় যে, পাঠক যদি সত্য দরদী হ'ন তবে এ-কয়টি ছোট গল্পের মধ্যে দিয়েই লেখিকার সত্যসন্ধানী মনের, সুকুমার চিত্তের, ঋজু দৃষ্টির ও নারীসুলভ দরদের পরিচয় পেয়ে কমবেশি মুগ্ধ হবেন। তবে বেশি মুগ্ধ হবেন বোধহয় তাঁরা যাঁরা গল্পে শুধু গল্প—অর্থাৎ ঘটনা-পর্য্যায় —চান না, চান : অন্তরের নানা উর্দ্ধ স্বপ্ন, সৌন্দর্য্যের তৃষ্ণা, সত্যের আকুতি ;—এক কথায়—যাঁরা গল্পে চান অন্তর্মুখিতা তাঁরাই বোধ করি এ-গল্পগুলিতে খুসি হবেন সবচেয়ে। অন্তত আমার এই রকমই মনে হয়—আমি নিজে সব সাহিত্যেই বহির্মুখিতার চেয়ে অন্তর্মুখিতার রসমূল্য বেশি দেই ব'লে।

এ-গল্পগুলি সবই-যে আলেখ্য-শিল্পে একান্ত অন্তর্মুখী তা নয় অবশ্য—যেমন অন্তর্মুখী বলা যেতে পারে জ্যোতির্মালার "সন্ধানে" ব'লে বৃহৎ উপন্যাসটিকে। সেটি ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু এ-সব গল্পেও আশা করি দরদী পাঠকের চোখে পড়বে যে, লেখিকা বাইরের ছবি আঁকবার সময়েও তাকে এঁকেছেন অন্তর্মুখী ভঙ্গিতেই, চূর্ণ তরঙ্গের চেকনাই ফলাবার সময়েও দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ বাইরেকার শীকরে নয়—অতলেই : তাই ওদের দেশের বাইরের চাল-চলনের ছবির মধ্যে দিয়েও তিনি ফুটিয়েছেন কোথায় ওরা অসার, কোথায় ওদের ভড়ং, জীবনে কোন্ বস্তু গভীর কোন্ বস্তু সস্তা। এই ভঙ্গিকেই আমি বলতে চাই অন্তর্মুখী ভঙ্গি। এ-ভঙ্গি জ্যোতির্মালার এত সহজে আয়ত্ত হয়েছে দেখেই আমার বিশ্বাস হয়েছে কথা-সাহিত্যে তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশ উজ্জ্বল—কারণ ভবিষ্যৎ যুগের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প ঢের বেশি অন্তর্মুখী হবে শ্রীঅরবিন্দের এ-কথা অপ্রতিবাদ্য ব'লেই মনে হয়—বর্ত্তমান শিল্পের অন্তর্মুখী প্রবণতাটিকে একটু তলিয়ে বুঝতে গেলেই। তবে লেখিকা আমার স্নেহভাজন ব'লে প্রথমটায় আমার মনে একটু কুণ্ঠা হয়েছিল এ-সব কথা বলতে—আমি তাঁর রচনার একটু বেশি পক্ষপাতী বুঝি বা। অসম্ভব নয়—কারণ আমি যা যতখানি ভালো লাগে অননুতপ্ত চিত্তে, অসাবধান ভঙ্গিতে ততখানিই ভালো ব'লে থাকি : বেশি এফেক্ট করার জন্যে হাতে রেখে কম ক'রে বলতে পারি না : অর্থাৎ কিনা, আমার স্বভাবটা রাশকড়া নিরপেক্ষ অতি-সাবধানী সমালোচক-বর্গীয় নয়। তাই ভেবেচিন্তে এ-গল্পগুলি ধূর্জ্জটিপ্রসাদকে পাঠাই, ব'লে যে, বিশেষ ভালো যদি না লাগে তবে একটি কথাও যেন তিনি না বলেন। (শ্রীঅরবিন্দ একবার আমাকে লিখেছিলেন যে, 'আর্য্য' লেখার সময়ে নানান বই-ই আসত তাঁর কাছে সমালোচনার্থে ; তাদের মধ্যে যাদের সম্বন্ধে তিনি মন খুলে ভালো বলতে পারতেন না তাদের সম্বন্ধে তিনি চুপ ক'রেই থাকতেন। এ-রীতিতে আমার মনও বরাবরই সায় দিয়েছে : যা ভালো লাগল না, যাকে স্বল্পায়ু মনে হ'ল, —সে অর্দ্ধমৃতের 'পরে কেনই বা খাঁড়ার ঘা?) যাহোক্, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ আমাকে বরাভয় দিয়ে লেখেন : মা ভৈঃ, এ আমার পক্ষপাত নয়—গল্পগুলি সত্যিই ভালো হয়েছে।

কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলা আমার কর্ত্তব্য : যে, আমি নিজে তথাকথিত নিরপেক্ষ কঠোর দৃষ্টির চেয়ে দরদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই (তার ভ্রমসম্ভাবনা সত্ত্বেও) প্রকৃষ্টতর সমালোচনা-ভঙ্গি ব'লে মনে করি—কেন না রচনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বেশি ধরা দেয় শেষোক্ত শ্রেণীরই মনের কাছে : দরদীরা সত্য গুণ যতটা বোঝেন, দেখেন, জানেন —বে-দরদী বিচারক কখনই ততটা বুঝতে দেখতে জানতে পারেন না। তা ছাড়া বিরাগীর কাছে অনুরাগীর ভালো-লাগাকে পক্ষপাত মনে হয়ই-যে। তাই না গেটে বলেছিলেন : "Aufrichtig zu sein kann Ich versprechen : unparteiisch zu sein aber nicht." (অর্থাৎ "অকপট হব এ-প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, কিন্তু সেটা নিরপেক্ষ হবেই এ-প্রতিশ্রুতি দেই কেমন ক'রে?") কিন্তু থাক এ-সব তর্ক, কেন না এ হ'ল রুচিভেদের সেই আদিম তর্ক—যার কোনো চরম নিষ্পত্তিই আজ পর্য্যন্ত কেউই ঠাউরে উঠতে পারেন নি। তাই উপস্থিত শুধু এইটুকু ব'লেই এ-পরিচিতির ইতি করি যে, এ-গল্পগুলি পড়বার সময়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা যেন এর মধ্যেকার অন্তঃশীলা অন্তর্মুখী ভঙ্গিটি লক্ষ্য করেন, যেন

মনে রাখেন একটি তরুণী বাঙালী মেয়ে খোলা মনে ও-দেশের দোষগুণ দেখছে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির নিকষে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খানিকটা যাচাই ক'রেই বৈ কি। তাহ'লে, মনে হয়, প্রথম প্রয়াসের ত্রুটি সত্ত্বেও এ-গল্পগুলির সার্থকতা, উজ্জ্বলতা ও রসালতা তাঁদের কাছে ধরা দেবে আরও বেশি, কেন না ধূর্জ্জটিপ্রসাদ যতই সংশয় প্রকাশ করুন না কেন, ভারতীয় মন ও চেতনার একটা সত্য বৈশিষ্ট্য যে আছেই আছে এ-কথা ধ্রুব —অপ্রতিবাদ্য। ইতি—

ওঁ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম,
পণ্ডিচেরী

নববর্ষ—১৩৪৩

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকাটি নিচে যথাযথ মুদ্রিত হল :

ভূমিকা

বাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্যিক সমৃদ্ধির অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে একটি হোলো সূক্ষ্মতর দৃষ্টির সাহায্যে তথাকথিত তুচ্ছ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা, এবং অন্যটি হোলো ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি। প্রথমটির সাক্ষাৎ সাধারণত মহিলা-সাহিত্যিকের লেখায় পাই : দ্বিতীয়টির পরিচয় মেলে বিদেশ-প্রত্যাগত একাধিক সাহিত্যিকের রচনায়। কোনো গৃহিণীর সঙ্গে যে-পুরুষ একবার ক'নে দেখতে গিয়েছেন তিনিই স্বীকার করবেন যে, তিনি যদি একবার কলম ধরতে শেখেন তবে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান পর্য্যবেক্ষণের প্রখরতায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে, এবং অ-প্রধানকে মর্য্যাদা দেবার ক্ষমতায় প্রকাশ পাবে। তা ছাড়া পুকুরঘাট থেকে ড্রয়িং রুমের সামাজিক আলোচনার সঙ্গে অন্তত কথা-সাহিত্যের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ যে রয়েইছে তার প্রমাণ মেলে উমা দেবী এবং অপরাজিতা দেবীর কবিতায়, এবং শরৎকুমারীর ও জ্যোতির্মালা দেবীর দেশী গল্পে।

ক্ষেত্র-বিস্তৃতির জন্য বিলেত-প্রবাসই প্রধানত দায়ী। পূর্ব্বেও বাঙালী বিদেশে গিয়েছেন এবং ফিরে এসে প্রবাস-জীবনের গল্প ও ডায়েরী ছাপিয়েছেন। সেই সব লেখার মধ্যে অনেকগুলিই সাহিত্যপদবাচ্য এবং এখনও আমাদের তৃপ্তি দেয়। কিন্তু কিছুকাল থেকে প্রবাসী সাহিত্যের উদ্দেশ্যটাই যেন বদলে গিয়েছে। শরৎবাবুর ব্রহ্মদেশে বাঙালী অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। সেখানকার সমাজ-বন্ধন শিথিল, তাই শৃঙ্খলিত পাঠক-পাঠিকা তাঁর প্রবাসের বর্ণনা পড়তে ভালবাসেন। অনেকের মতে ব্রহ্মদেশেই তাঁর নায়িকা সজীব হ'য়ে উঠেছে। তাঁর বিদেশী ও বিদেশিনীরাও জীবন্ত। বর্ণিত ঘটনা থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার রীতি নীতি অনুমান ক'রে নিতে হবে। অন্য যে-শ্রেণীর গল্পের ও নভেলের কথা বললাম তাতে অনুমানের অবকাশ নেই—সেখানে ঘটনাধারা ও চিন্তাস্রোতই প্রধান। ব্যক্তিগত জীবন সেই স্রোতের ফুল।

অবশ্য মনে মনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই অনেকদিন থেকে বিদেশী। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিদেশী জীবনের ও মনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে

কেতাবী পরিচয়ের তুলনা হয় না। কলসীর গঙ্গাজলে পুণ্যের চেয়ে স্রোতস্বিনীতে অবগাহনে পুণ্য বেশি—এ নিশ্চয়।

কালাপানি পার হওয়ার পূর্ব্বেকার আতঙ্ক আজকাল সাহিত্যিক মঙ্গল-কামনায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অনেকেই ভয় পাচ্ছেন যে য়ুরোপীয় জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের বৈশিষ্ট্য লোপ পাচ্ছে, এবং তারই ফলে আমাদের সাহিত্য হ'য়ে উঠছে তৃতীয় শ্রেণীর কনটিনেণ্টাল রচনার অনুবাদ ও অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বাঙালীর বাঙালীত্ব ব'লে যদি কোন গুহ্যসত্তা থাকে তবে সেটা আমাদের এতই মজ্জাগত যে তাকে চেতনারাজ্যের আদান-প্রদান ও চেতনাহীন অনুকরণের বহির্ভূত ভাবা যায় না কি? আর বাঙালীর জাতিগত মন ও মনুষ্যত্ব? ঐ দুটি বস্তুর কোনোটি নিয়ে মানুষ জন্মায় না—দুটি উৎপন্ন হয় ঘাত-প্রতিঘাতে, আকর্ষণ-বিকর্ষণে, মন্থনে।

আমি বাঙালীত্ব অর্থে একপ্রকার ঐতিহ্য বুঝি। বাঙালীর ঐতিহ্য যদি কিছু থাকে তবে সেটি বাঙালিনীর মধ্যেই প্রবহমান। এক কথায়, বাঙালী মানেই বাংলার মেয়ে। হয়ত, এখনও বাঙালী মেয়েদের মনের কোনো বালাই নেই—কিন্তু বাঙালী মেয়েদেরই চোখ সমাজ-গঠনের দিক থেকেও শরৎবাবুর প্রবাস-সাহিত্য তাঁর কল্পিত ভবিষ্যতের আভাস দেয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে অনেকে সন্তুষ্ট ন'ন। সেখানকার বাঙালী-জীবনও যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন নয়, সহজ নয়। আজকাল দলে দলে বাঙালী যুবক-যুবতীরা ভারতবর্ষের বাইরে যাচ্ছেন এমন সব দেশে—যেখানকার জীবন আমাদের মতন এইভাবে শৃঙ্খলিত নয়, যেখানকার সামাজিক ভাঙনগড়নের গুরুভার কর্ত্তাদের হাতে ন্যস্ত নয়, দেশস্থ যুবক-যুবতীর অনুপ্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত। এঁরা যখন বিদেশী জীবনের বর্ণনা দেন তখন আমরা একটি চলিষ্ণু সভ্যতার পরিচয় পাই। পূর্ব্বকার প্রবাসী সাহিত্যে পেতাম একজন বাঙালীর জীবনের উপর যেন একটি কঠিন বস্তুর আঘাতের বর্ণনা। কারণ বোধ হয় এই—তখন বিদেশী সভ্যতার রূপ ছিল স্থির।

যাঁরা কথা-সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবনকেই মুখ্য ভাবেন তাঁরা ঠিক ঐ কারণেই পুরাণো ধরণের বিদেশী গল্প ও নভেলকেই যথার্থ সাহিত্য বলবেন। যাঁরা ভাবেন এই যুগে ব্যক্তি নেই, ব্যক্তিগত জীবন অসম্ভব, এবং সভ্যতার রূপের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটছে ব'লে ব্যক্তি কোথাও দাঁড়াবার স্থান খুঁজে পাচ্ছেনা, আছে কেবল মন্থন, আন্দোলন আর একীকরণ, তাঁরা নতুন ধরণের প্রবাসী-সাহিত্যে ঐ প্রকার সভ্য জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখে উল্লসিত হবেন। জ্যোতির্মালা দেবীর গল্প প্রথম শ্রেণীর। বইখানির ছত্রে ছত্রে একজন বাঙালী রমণীর মনে বিদেশ প্রবাসের প্রতিক্রিয়া ফুটে আছে, মনুষ্যত্ব আছে। দৃষ্টিশক্তি আর মনুষ্যত্বের অভিসন্ধিতেই সাহিত্যিক প্রবৃত্তির উৎপত্তি, সেই প্রবৃত্তি গঠন পায় ভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই সাহিত্যিক প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তাকে মন বলা চলেনা। মন যার তৈরি হয়েছে তারই কলম চলে। বাঙালী মেয়েদের মন তৈরি হ'লে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি অনিবার্য্য, এবং অযথা অনুকরণের আশঙ্কাও কম।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে জ্যোতির্মালা দেবীর প্রথম পুস্তকের ভূমিকা লিখছি। লেখিকা অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, এবং য়ুরোপীয় জীবনের নানাদিকের সঙ্গে তাঁর

পরিচয় নিবিড়। বইখানিতে দেশী ও বিলাতী উভয়শ্রেণীর গল্পই আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প পড়লেই লেখিকার স্বকীয়তা হানির ভয় অপসৃত হয়। তাঁর প্রত্যেক পটভূমিতেই পরিস্ফুট হয়েছে রমণীসুলভ কমনীয়তা, সহৃদয়তা ও পর্য্যবেক্ষণশীলতা। অন্যভাবে বলা চলে যে, ইংলণ্ডের সমাজ তাঁর দৃষ্টিশক্তির পটভূমি, তাঁর ভাবৈশ্বর্য্যের আধার এবং তাঁর মননশক্তির নিকষ। লেখিকার কল্যাণে সাহিত্যের বিস্তৃত অবস্থান একটি বিশেষ রূপপরিগ্রহ করেছে—যেটি আমাদের ভারতীমন্দিরে দীপলক্ষ্মীর মতন বিরাজ করবে। বাঙালী মহিলার এই কৃতিত্বে গর্ব্ব অনুভব না ক'রে থাকা যায়না। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের মতন "বিলেত দেশটা"কে "মাটির" বলেছেন। এই উক্তিতে কোনো জাত্যভিমান নেই —আছে সার্ব্বভৌমিকতা, সেইজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লেখিকার অন্যান্য সাহিত্যিক গুণাবলী পাঠক-পাঠিকার বিচার্য্য। কিন্তু যাঁর হাত থেকে এমন সুচারু আল্‌পনা বেরোয়, বিশেষ ক'রে, যিনি "রাশিয়ান ক্যাট"-এর মতন সুশ্রী গল্প লিখতে পারেন তাঁর শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ।

১৩৪২, লক্ষ্ণৌ — ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতির্মালা দেবী-লিখিত 'নিবেদন' অংশটিতে আছে :

নিবেদন

"বিলেত দেশটা মাটির" বইটির ভূমিকার জন্যে শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নানা সাহায্য ও নির্দ্দেশের জন্যে নলিনীকান্ত ও নীরদবরণের কাছে আমি ঋণী। শ্রীরামেশ্বর দে-ও অনেক সাহায্য করেছেন পুস্তক মুদ্রণ বিষয়ে। সুচারু প্রচ্ছদপটখানি এঁকেছেন আশ্রমের প্রতিভাবান কিশোরশিল্পী শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ পালিত। শ্রীঅনিলবরণ রায়, শ্রীসোমনাথ মৈত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও আরও অনেকে গল্পগুলি প'ড়ে উৎসাহ দিয়েছেন ব'লেও তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ।

শ্রীমতী ভার্জিনিয়া নারী-সম্বন্ধে তাঁর একটি উজ্জ্বল অভিভাষণ থেকে কয়েকটি সুন্দর লাইন উদ্ধৃত ও অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন ব'লে তাঁকে ও তাঁর প্রকাশক হগার্থ প্রেসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি : সুকবি নিশিকান্ত এটুকুর ছায়ানুবাদ করেছেন এজন্যে তাঁকেও। প্রচ্ছদ পত্রিকায় মূল ও অনুবাদ দেওয়া হ'ল।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী
নববর্ষ, ১৩৪৩

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

বইয়ের মূল পাঠ্যাংশ শুরু হবার আগে ভার্জিনিয়া উলফ্-এর একটি উক্তি এবং উলফ্-এর মন্তব্যের নিশিকান্ত-কৃত একটি কাব্যানুবাদ আছে। লেখাদুটো উদ্ধৃত হল :

VIRGINIA WOOLF :

But this creative power differs greatly from the creative power of men. And one must conclude that it would be a thousand pities if it were hindered or wasted, for it was won by centuries of the most drastic discipline, and there is nothing to take its place. It would be a thousand pities if women wrote like men, or lived like men, or looked like men, for if two sexes are quite inadequate, considering the vastness and variety of the world, how should we manage with one only?

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর এই উক্তির কবি নিশিকান্ত-কৃত কাব্যানুবাদটি এইরকম :

নারী

হে নারী,
শক্তির বিকাশ তব আপনার বৃন্ত-অধিকারী,
পুরুষের শক্তি হ'তে সে স্বতন্ত্র, চির-অনন্যা সে—
যুগ-যুগ-আস্পৃহার প্রকাশ-প্রয়াসে।
হে সাধিকা, সাধনার একান্ত নিষ্ঠায়
প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়
পলে পলে—পুঞ্জিত বাধার বন্ধুর বন্ধন টুটি'
আজ তুমি উঠিয়াছ ফুটি'
উন্মুক্তির দীপ্ত শতদলে!
তোমার আত্মার বাণী আনিল অপূর্ব্ব বার্ত্তা বিশ্ব-সভাতলে।
এবে তুমি ঋণী করিয়ো না,
বরিয়ো না পুরুষের যাত্রাপথ : পরিয়ো না
ছদ্মবেশ—যাহা তব নয়।
তোমার সঞ্চয়
থাক ভরি'
সৃষ্টির মালঞ্চে—যেথা মল্লিকা-মঞ্জরী
মুক্ত গন্ধরাজ পাশে
অকুণ্ঠ উল্লাসে
সর্ব্বাণীর আশীর্ব্বাদ লভি'—শুভ্র ভালে
বিশ্ব-বিবর্ত্তন তালে
কালে কালে—বিচিত্রের বিকাশের মন্ত্র চলে জপি'।

(অনুবাদ—নিশিকান্ত)

এই লেখাদুটিই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচ্ছদ-পত্রিকায় (flap) মুদ্রিত হয়েছিল।

উপন্যাস

১. *রক্তগোলাপ*। শ্রীমতী জ্যোতির্মালা। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫১। [আখ্যাপত্রে প্রকাশ তারিখের উল্লেখ নেই]।

উৎসর্গ :

হে অচিন প্রিয়তম!
যামিনীর যত কণ্টকব্যথা শিহরে তিমির-মায়ায়,
রক্তগোলাপে রাঙিল বলিয়া সঁপিনু চরণছায়ায়
অর্ঘ্যকুসুম সম।

উপন্যাসটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় চারটির শিরোনাম যথাক্রমে : ১. চেনা-অচেনা ; ২. ঊষরে ; ৩. কণ্টকবন ; ৪. রক্তগোলাপ। শেষ তিনটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে দু'লাইনের একটি করে কবিতা আছে। যথা :

ঊষরে

আঁখিপাত রবি মেদিনীর বুকে ফোটায় অসীম স্বপনলিখা,
অচিন-আঁধার ঊষরে নিভিল দূর-জয়ন্তী সে-দীপশিখা।

কণ্টকবন

ফল্গুর স্রোতে কোথা ব'য়ে যাও হায় অভিসারী মরু-ক্রন্দন,
ফুটিবে না ফুল—তপ্ত অনলে জাগিল শুধুই কণ্টকবন।

রক্তগোলাপ

কোন পবনের মৃদু নিশ্বাসে সুরভি কোমল কী বীজ ছিল,
মরুভূর ওই বেদনা-শিহর রক্তগোলাপে প্রস্ফুটিল।

২. *সন্ধানে*। শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী। দি কালচার পাবলিশার্স। ২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৪৭। উৎসর্গ : শ্রী অরবিন্দ-চরণে।
এই উপন্যাসগ্রন্থটি আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, হিরণ লাইব্রেরি বা বালিগঞ্জ ইনসটিট্যুটের সংগ্রহে বইটি থাকলেও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ বইটি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে দিতে পারেননি। সম্ভবত বইটি হারিয়ে গেছে।